সুন্নাতের আলোকে মুমিনের জীবন-১

আল্লাহর পথে দা'ওয়াত

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

পি-এইচ.ডি. (রিয়াদ), এম.এ. (রিয়াদ) এম.এম. (ঢাকা)

সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স

ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ

সুন্নাতের আলোকে মুমিনের জীবন-১

আল্লাহর পথে দা'ওয়াত

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)
সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ

الدعوة إلى الله

تأليف: دكتور خوندكار أبو نصر محمد عبد الله جهانغير

আল্লাহর পথে দা'ওয়াত

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

প্রকাশক
উসামা খোন্দকার
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা)
বি. বি. রোড. ঝিনাইদহ-৭৩০০
ফোন ও ফ্যাক্স: ০৪৫১-৬২৫৭৮; মোবাইল: ০১৭১১১৫২৯৫৪

প্রাপ্তিস্থান:
১. দারুল শরীয়াহ খানকায়ে ফুরফুরা, পাকশী, ইশ্বরদী, পাবনা
২. ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
৩. আল-ফারুক একাডেমী, ধোপাঘাটা-গোবিন্দপুর, ঝিনাইদহ-৭৩০০

প্রথম প্রকাশ: ১৪২৫ হিজরী/ ২০০৪ ঈসায়ী (ইশাআতে ইসলাম কুতুবখানা)

পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ: **সফর ১৪৩০ হিজরী**
মাঘ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
ফেব্রুয়ারী ২০০৯ ঈসায়ী

হাদিয়া
৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র।

"Allahar Pathe D'awat" (Calling to Allah), written by Dr. Khandaker Abdullah Jahangir and published by Usama Khandaker, As-Sunnah Pablications, Jaman Supur Market, B. B. Road, Jhenidah-7300. February 2009. Price TK-40.00

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুরফুরার পীর আমীরুল ইত্তিহাদ মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দীকী আল-কুরাইশী সাহেবের

বাণী

নাহ্মাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম, আম্মাবা'দ

আমার স্নেহাস্পদ জামাতা খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর আল্লাহর পথে দা'ওয়াতের গুরুত্ব ও আহকাম সম্পর্কে একটি পুস্তিকা রচনা করেছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহর পথে দা'ওয়াত বা সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধই নবী-রাসূলগণের (আ) দায়িত্ব। উম্মতে মুহাম্মাদীর অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্যও দা'ওয়াত ইলাল্লাহ। এই দায়িত্বের সফল আঞ্জাম দেওয়ার উপর নির্ভর করছে মুসলিম উম্মাহর দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা ও নাজাত।

কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করে এ বিষয়ক গ্রন্থ রচনা সময়োপযোগী হয়েছে বলে মনে করছি। বিশেষত, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ বা আল্লাহর পথে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী, দা'য়ীর গুণাবলী ও এ বিষয়ক বিভিন্ন ভুলভ্রান্তির কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক আলোচনা খুবই উপযোগী ও কল্যাণকর হয়েছে বলে মনে করি।

বইটির বহুল প্রচার ও প্রসারের জন্য দোয়া করছি। আশা করি আমার সকল মুহিব্বীন, মুবাল্লিগীন এবং সর্বস্তরের সকল আলেম ও দীনদার মুসলিম বইটি পাঠ করবেন এবং উপকৃত হবেন। বিশেষত, ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় কর্মরত আমাদের সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষেরা দলমত নির্বিশেষে এই পুস্তিকাটি থেকে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি।

দোয়া করি আল্লাহ লেখকের এই প্রচেষ্টা কবুল করে নিন এবং এই বইকে তাঁর ও আমাদের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন।

আহ্কারুল এবাদ,

আবুল আনসার সিদ্দীকী
(পীর সাহেব, ফুরফুরা)

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল-হামদু লিল্লাহ। ওয়া সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ। ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

আল্লাহর পথে আহ্বান করতেই নবী-রাসূলগণের (আ) আগমন। মুমিনের জীবনের অন্যতম দায়িত্ব এই দা'ওয়াত। কুরআন কারীমে এ দায়িত্বকে কখনো দা'ওয়াত, কখনো সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ, কখনো প্রচার, কখনো নসীহত ও কখনো দীন প্রতিষ্ঠা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ কাজের গুরুত্ব, এর বিধান, পুরস্কার, এ দায়িত্ব পালনে অবহেলার শাস্তি, এ কর্মে অংশগ্রহণের শর্তাবলী ও এর জন্য আবশ্যকীয় গুণাবলী আলোচনা করেছি এই পুস্তিকাটিতে। এ বিষয়ক কিছু ভুলভ্রান্তি, যেমন বিভিন্ন অজুহাতে এ দায়িত্বে অবহেলা, ফলাফলের ব্যস্ততা বা জাগতিক ফলাফল ভিত্তিক সফলতা বিচার, এ দায়িত্ব পালনে কঠোরতা ও উগ্রতা, আদেশ, নিষেধ বা দা'ওয়াত এবং বিচার ও শাস্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়, আদেশ, নিষেধ বা দা'ওয়াত এবং গীবত ও দোষ অনুসন্ধানের মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেছি। সবশেষে এ 'ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে সুন্নাতে নববী এবং এ বিষয়ক কিছু ভুলভ্রান্তির কথা আলোচনা করেছি।

হাদীসের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সহীহ বা নির্ভরযোগ্য হাদীসের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করেছি। মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার মাধ্যমে হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নির্ধারণ করেছেন, যে নিরীক্ষা-পদ্ধতি বিশ্বের যে কোনো বিচারালায়ের সাক্ষ্য-প্রমাণের নিরীক্ষার চেয়েও বেশি সুক্ষ্ম ও চুলচেরা। এর ভিত্তিতে যে সকল হাদীস সহীহ বা হাসান অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে আমি আমার আলোচনায় শুধুমাত্র সে হাদীসগুলিই উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি।

অতি নগন্য এ প্রচেষ্টাটুকু যদি কোনো আগ্রহী মুমিনকে উপকৃত করে তবে তা আমরা বড় পাওয়া। কোনো সহৃদয় পাঠক দয়া করে পুস্তিকাটির বিষয়ে সমালোচনা, মতামত, সংশোধনী বা পরামর্শ প্রদান করলে তা লেখকের প্রতি তাঁর এহসান ও অনুগ্রহ বলে গণ্য হবে।

মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি দয়া করে এ নগন্য কর্মটুকু কবুল করে নিন এবং একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও পাঠকদের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন। আমীন!

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

সূচীপত্র

আল্লাহর পথে দা'ওয়াত

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিচিতি, গুরুত্ব ও বিষয়বস্তু

১. ১. পরিচিতি: দা'ওয়াহ, আমর, নাহই, তাবলীগ, নসীহত, ওয়ায

নিজের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নির্দেশনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি নিজের আশেপাশে অবস্থানরত অন্যান্য মানুষদের মধ্যে আল্লাহর দীনকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। এজন্য মুমিনের জীবনের একটি বড় দায়িত্ব হলো 'আল-আমরু বিল মারূফ ওয়ান নাহ্ইউ আনিল মুনকার', অর্থাৎ 'ন্যায় কাজের নির্দেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা'। আদেশ ও নিষেধ-কে একত্রে 'আদ-দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ' বা 'আল্লাহর দিকে আহ্বান' বলা হয়। এ ইবাদাত পালনকারীকে "দা'য়ী ইলাল্লাহ" বা "আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী" ও সংক্ষেপে "দা'য়ী", অর্থাৎ "দা'ওয়াতকারী" বা "দাওয়াত-কর্মী" বলা হয়।

দা'ওয়াত (الدعوة) শব্দের অর্থ আহ্বান করা বা ডাকা। আরবীতে আম্র (الأمر) বলতে আদেশ, নির্দেশ, উপদেশ, অনুরোধ, অনুনয় সবই বুঝায়। অনুরূপভাবে 'নাহই' (النهي) বলতে নিষেধ, বর্জনের অনুরোধ ইত্যাদি বুঝানো হয়।

কুর্আন-হাদীসে এই দায়িত্ব বুঝানোর জন্য আরো অনেক পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে: তন্মধ্যে রয়েছে আত-তাবলীগ (التبليغ), আন-নাসীহাহ (النصيحة), আল-ও'য়ায (الوعظ) ইত্যাদি। আত-তাবলীগ অর্থ পৌঁছানো, প্রচার করা, খবর দেওয়া, ঘোষণা দেওয়া বা জানিয়ে দেওয়া। শব্দ আন-নসীহাহ শব্দের অর্থ আন্তরিক ভালবাসা ও কল্যাণ কামনা। এ ভালবাসা ও কল্যাণ কামনা প্রসূত ওয়ায, উপদেশ বা পরামর্শকেও নসীহত বলা হয়। 'ওয়ায' বাংলায় প্রচলিত অতি পরিচিত আরবী শব্দ। এর অর্থ উপদেশ, আবেদন, প্রচার, সতর্কীকরণ ইত্যাদি। দা'ওয়াতের এই দায়িত্ব পালনকে কুরআন কারীমে 'ইকামতে দীন' বা দীন প্রতিষ্ঠা বলে অভিহিত করা হয়েছে। এগুলি সবই একই ইবাদতের বিভিন্ন নাম এবং একই ইবাদতের বিভিন্ন দিক। পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা তা বুঝতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

১. ২. কুরআন-হাদীসের আলোকে দা'ওয়াত-এর গুরুত্ব

১. ২. ১. নবী-রাসূলগণের মুল দায়িত্ব

সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ, প্রচার, নসীহত, ওয়ায বা এককথায় আল্লাহর দীন পালনের পথে আহ্বান করাই ছিল সকল নবী ও রাসূলের (আলাইহমুস সালাম) দায়িত্ব। সকল নবীই তাঁর উম্মাতকে তাওহীত ও ইবাদতের আদেশ করেছেন এবং শিরক, কুফর ও পাপ থেকে নিষেধ করেছেন। সূরা আ'রাফের ১৫৭ আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন:

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الأُمِّيَ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْباً عِنْدَهُمْ فِيْ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

"যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যাঁর উল্লেখ তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইনজীলে লিপিবদ্ধ পায়, যিনি তাদেরকে সৎকার্যের নির্দেশ দেন এবং অসৎকার্য থেকে নিষেধ করেন...।"

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহর (ﷺ) কর্মকে আদেশ ও নিষেধ নামে অভিহিত করা হয়েছে। অন্যত্র এ কর্মকে দা'ওয়াত বা আহ্বান নামে অভিহিত করা হয়েছে। সূরা হাদীদ-এর ৮ আয়াতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন:

وَمَا لَكُمْ لاَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ

"তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন না, অথচ রাসূল তোমাদেরকে আহ্বান করছেন যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন।"

সূরা নাহল-এর ১২৫ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ দায়িত্বকে দা'ওয়াত বা 'আহ্বান' বলে অভিহিত করে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ

"আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন হিকমাত বা প্রজ্ঞা দ্বারা এবং সুন্দর ওয়ায-উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা-বিতর্ক করুন।"

অন্যত্র এই দায়িত্বকেই তাবলীগ বা প্রচার বলে অভিহিত করা হয়েছে। সূরা মায়েদার ৬৭ আয়াতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

"হে রাসূল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলেন না।"

কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে, প্রচার বা পৌঁছানোই রাসূলগণের একমাত্র দায়িত্ব। সূরা নাহ্ল-এর ৩৫ আয়াতে বলা হয়েছে,

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ

"রাসূলগণের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা।"

এই দায়িত্বকেই অন্যত্র নসীহত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সূরা আ'রাফের ৬২ আয়াতে নূহ (আ) এর যবানীতে বলা হয়েছে,

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ

"আমি আমার প্রতিপালকের রিসালাতের দায়িত্ব তোমাদের কাছে পেঁছে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের নসীহত করছি।"

সূরা আ'রাফের ৬৮, ৭৯, ৯৩ আয়াত, সূরা হূদ-এর ৩৪ আয়াত ও অন্যান্য স্থানে দা'ওয়াতকে 'নসীহত' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সূরা শুরার ১৩ আয়াতে বলেছেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে- আর যা আমি ওহী করেছি আপনাকে- এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে দলাদলি-বিচ্ছিন্নতা করো না। আপনি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছেন তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়।"

তাবারী, ইবনু কাসীর ও অন্যান্য মুফাস্সির সাহাবী-তাবিয়ী মুফাস্সিরগণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো দীন পালন করা। আর দীন পরিপূর্ণ পালনের মধ্যেই রয়েছে আদেশ, নিষেধ ও দা'ওয়াত। এ অর্থে কোনো কোনো গবেষক দীন পালন বা নিজের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অন্যদের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার দা'ওয়াতকেও "ইকামতে দীন" বলে গণ্য করেছেন।

১. ২. ২. উম্মাতে মুহাম্মাদীর অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য

দা'ওয়াত, আদেশ-নিষেধ, দীন প্রতিষ্ঠা বা নসীহতের এই দায়িত্বই উম্মাতে মুহাম্মাদীর অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য। সূরা আল-ইমরানের ১০৪ আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"তোমাদের মধ্যে এমন জাতি হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ন্যায়কার্যে নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় কার্যে নিষেধ করবে এবং এরাই সফলকাম।"

সূরা আল-ইমরানের ১১০ আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّه

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা ন্যায়কার্যে আদেশ এবং অন্যায় কার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর।"

প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে সূরা আল-ইমরানের ১১৪ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الأَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

"তারা আল্লাহ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সৎকার্যের নির্দেশ দেয়, অসৎকার্যে নিষেধ করে এবং তারা সৎকার্যে প্রতিযোগিতা করে। তারাই সজ্জনদিগের অন্তর্ভুক্ত।"

সূরা তাওবার ৭১ আয়াতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"মুমিন নরনারী একে অপরের বন্ধু, এরা ন্যায়কার্যে নির্দেশ দেয়, অন্যায় কার্যে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকেই আল্লাহ কৃপা করবেন। এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

সূরা তাওবার ১১২ আয়াতে, সূরা হজ্জের ৪১ আয়াতে, সূরা লুকমানের ১৭ আয়াতে ও অন্যান্য স্থানেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রকৃত মুমিন বান্দাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ। এভাবে আমরা দেখছি যে, ঈমান, নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদতের মত সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজের নিষেধ মুমিনের অন্যতম কর্ম। শুধু তাই নয়, মুমিনদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের দাবি হলো যে, তারা একে অপরের অন্যায় সমর্থন করেন না, বরং একে অপরকে ন্যায়কর্মে নির্দেশ দেন এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করেন। এখানে আরো লক্ষণীয় যে, এ সকল আয়াতে ঈমান, নামায, যাকাত ইত্যাদির আগে সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এথেকে আমার মুমিনের জীবনে এর সবিশেষ গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি।

এই দায়িত্বপালনকারী মুমিনকেই সর্বোত্তম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সূরা হা মীম সাজদা (ফুস্‌সিলাত) এর ৩৩ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"

আমরা দেখেছি যে, আদেশ-নিষেধ বা দা'ওয়াত-এর আরেক নাম 'নসীহত'। 'নসীহত' বর্তমানে সাধারণভাবে উপদেশ অর্থে ব্যবহৃত হলেও মূল আরবীতে 'নসীহত' অর্থ আন্তরিকতা ও কল্যাণ-কামনা। কারো প্রতি আন্তরিকতা ও কল্যাণ কামনার বহিঃপ্রকাশ হলো তাকে ভাল কাজের পরামর্শ দেওয়া ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা। এ কাজটি মুমিনদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অন্যতম দায়িত্ব। বরং এই কাজটির নামই দীন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

"দীন হলো নসীহত।" সাহাবীগণ বলেন, কার জন্য? তিনি বলেন, "আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের (ﷺ) জন্য, মুসলিমগণের নেতৃবর্গের জন্য এবং সাধারণ সকল মুসলিমের জন্য।" (মুসলিম।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ 'নসীহতের' জন্য সাহাবীগণের বাই'য়াত বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন হাদীসে জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রা), মুগীরা ইবনু শু'বা (রা) প্রমুখ সাহাবী বলেন,

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

"আমি রাসূলুল্লাহর (ﷺ) নিকট বাই'য়াত বা প্রতিজ্ঞা করলাম, সালাত কায়েমের, যাকাত প্রদানের, এবং প্রত্যেক মুসলিমের নসীহত করার।" (বুখারী)

এ অর্থে তিনি সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধের বাই'য়াত গ্রহণ করতেন। 'উবাদাহ ইবন সামিত ও অন্যান্য সাহাবী (রা) বলেন,

إِنَّا بَايَعْنَاهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ .... وَعَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ فِي اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلا نَخَافُ لَوْمَةَ لائِمٍ فِيهِ

"আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হাতে বাই'য়াত করি আনুগত্যের.... এবং সৎকর্মে আদেশের এবং অসৎকর্মে নিষেধের এবং এই বলে যে, আমরা মহিমাময় আল্লাহর জন্য কথা বলব এবং সে বিষয়ে কোনো নিন্দুকের নিন্দা বা গালি গালাজের তোয়াক্কা করব না।" (আহমদ। বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য সনদে।)

১. ৩. ক্ষমতা বনাম দায়িত্ব ও ফরয আইন বনাম ফরয কিফায়া

আদেশ নিষেধের জন্য স্বভাবতই ক্ষমতা ও যোগ্যতা প্রয়োজন। এজন্য যারা সমাজে ও রাষ্ট্রে দায়িত্ব ও ক্ষমতায় রয়েছেন তাদের জন্য এ দায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফরয আইন বা ব্যক্তিগতভাবে ফরয। দায়িত্ব ও ক্ষমতা যত বেশি আদেশ ও নিষেধের দায়িত্বও তত বেশি। আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়ও তাদের তত বেশি। সূরা হজ্জ-এর ৪১ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ

"যাদেরকে আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে বা ক্ষমতাবান করলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, সৎকার্যে নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্যে নিষেধ করে। আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারে।"

এজন্য এ বিষয়ে শাসকগোষ্ঠী, প্রশাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, আঞ্চলিক প্রশাসকগণ, বিচারকগণ, আলিমগণ, বুদ্ধিজীবিগণ ও সমাজের অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দায়িত্ব অন্যদের চেয়ে বেশী, তাদের জন্য আশংকাও বেশি। তাদের মধ্যে কেউ যদি দায়িত্ব পালন না করে নিশ্চুপ থাকেন তবে তার পরিণতি হবে কঠিন ও ভয়াবহ।

অনুরূপভাবে নিজের পরিবার, নিজের অধীনস্থ মানুষগণ ও নিজের প্রভাবাধীন মানুষদের আদেশ ও নিষেধ করা গৃহকর্তা বা কর্মকর্তার জন্য ফরয আইন। কারণ আল্লাহ তাকে এদের মধ্যে ক্ষমতাবান ও দায়িত্বশীল করেছেন এবং তিনি তাকে এদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالإِمَامُ (الأَمِيرُ) الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

"সাবধান! তোমরা সকলেই অভিভাবকত্বের দায়িত্ব প্রাপ্ত এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্বাধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। মানুষদের উপর দায়িত্ব-প্রাপ্ত শাসক বা প্রশাসক অভিভাবক এবং তাকে তার অধিনস্থ জনগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। বাড়ির কর্তাব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবক এবং তাকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ি ও তার সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব প্রাপ্তা এবং তাকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অন্যায় ও অসৎকর্মের প্রতিবাদ করা শুধুমাত্র এদেরই দায়িত্ব। বরং তা সকল মুসলমানের দায়িত্ব। যিনি অন্যায় বা গর্হিত

কর্ম দেখবেন তার উপরেই দায়িত্ব হয়ে যাবে সাধ্য ও সুযোগমত তার সংশোধন বা প্রতিকার করা। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.

"তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় দেখতে পায় তবে সে তাকে তার বাহুবল দিয়ে পরিবর্তন করবে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে সে তার বক্তব্যের মাধ্যমে তা পবিবর্তন করবে। এতেও যদি সক্ষম না হয় তাহলে সে তার অন্তর দিয়ে তার পরিবর্তন (কামনা) করবে, আর এটাই হলো ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।" (মুসলিম)

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক মুমিনেরই দায়িত্ব হলো, অন্যায় দেখতে পেলে সাধ্য ও সুযোগ মত তার পরিবর্তন বা সংশোধন করা। এক্ষেত্রে অন্যায়কে অন্তর থেকে ঘৃণা করা এবং এর অবসান ও প্রতিকার কামনা করা প্রত্যেক মুমিনের উপরেই ফরয। অন্যায়ের প্রতি হৃদয়ের বিরক্তি ও ঘৃণা না থাকা ঈমান হারানোর লক্ষণ। আমরা অগণিত পাপ, কুফুরী, হারাম ও নিষিদ্ধ কর্মের সায়লাবের মধ্যে বাস করি। বারংবার দেখতে দেখতে আমাদের মনের বিরক্তি ও আপত্তি কমে যায়। তখন মনে হতে থাকে, এ তো স্বাভাবিক বা এ তো হতেই পারে। পাপকে অন্তর থেকে মেনে নেওয়ার এ অবস্থাই হলো ঈমান হারানোর অবস্থা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) যা নিষেধ করেছেন বা যা পাপ ও অন্যায় তাকে ঘৃণা করতে হবে, যদিও তা আমার নিজের দ্বারা সংঘটিত হয় বা বিশ্বের সকল মানুষ তা করেন। এ হলো ঈমানের ন্যূনতম দাবী।

উপরের আয়াত ও হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, ক্ষমতার ভিত্তিতে এই ইবাদতটির দায়িত্ব বর্তাবে। এজন্য ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, দীন প্রতিষ্ঠা বা দা'ওয়াত ও আদেশ-নিষেধের এ ইবাদতটি সাধারণভাবে ফরয কিফায়া।

যদি সমাজের একাধিক মানুষ কোনো অন্যায় বা শরীয়ত বিরোধী কর্মের কথা জানতে পারেন বা দেখতে পান তাহলে তার প্রতিবাদ বা প্রতিকার করা তাদের সকলের উপর 'সামষ্টিক ফরয' বা 'ফরযে কিফায়া'। তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি এ দায়িত্ব পালন করেন তবে তিনিই ইবাদতটি পালনের সাওয়াব পাবেন এবং বাকীদের জন্য তা মূলত 'নফল' ইবাদতে পরিণত হবে। বাকি মানুষেরা তা পালন করলে সাওয়াব পাবেন, তবে পালন না করলে গোনাহগার হবেন না। আর যদি কেউই তা পালন না করেন তাহলে সবাই পাপী হবেন। দুইটি কারণে তা ফরযে আইন বা ব্যক্তিগত ফরযে পরিণত হয় :

প্রথমত, ক্ষমতা। যদি কেউ জানতে পারেন যে, তিনিই এ অন্যায়টির প্রতিকার করার ক্ষমতা রাখেন তাহলে তার জন্য তা ফরয আইন-এ পরিণত হয়। পরিবারের অভিভাবক, এলাকার বা দেশের রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক

কর্মকর্তা ও নেতৃবৃন্দের জন্য এ দায়িত্বটি এ পর্যায়ে ফরয আইন। এছাড়া যে কোনো পরিস্থিতিতে যদি কেউ বুঝতে পারেন যে, তিনি হস্তক্ষেপ করলে বা কথা বললে অন্যায়টি বন্ধ হবে বা ন্যায়টি প্রতিষ্ঠিত হবে তবে তা তার জন্য 'ফরয আইন' বা 'ব্যক্তিগতভাবে ফরয' হবে।

দ্বিতীয়ত, দেখা। যদি কেউ জানতে পারেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ অন্যায়টি দেখে নি বা জানে নি, তবে তার জন্য তা নিষেধ করা ও পরিত্যাগের জন্য দা'ওয়াত দেওয়া 'ফরয আইন' বা 'ব্যক্তিগত ফরয'-এ পরিণত হয়। সর্বাবস্থায় এ প্রতিবাদ, প্রতিকার ও দা'ওয়াত হবে সাধ্যানুযায়ী হাত দিয়ে, মুখ দিয়ে বা অন্তর দিয়ে।

১. ৪. আল্লাহর পথে দা'ওয়াত-এর বিষয়বস্তু

দা'ওয়াত, আদেশ, নিষেধ, ওয়ায, নসীহত ইত্যাদির বিষয়বস্তু কী? আমরা কোন্ কোন্ বিষয়ের দা'ওয়াত বা আদেশ-নিষেধ করব? কোন্ বিষয়ের কতটুকু গুরুত্ব দিতে হবে? আমরা কি শুধুমাত্র নামায রোযা ইত্যাদি ইবাদতের জন্য দা'ওয়াত প্রদান করব? নাকি চিকিৎসা, ব্যবসা, শিক্ষা, সমাজ, মানবাধিকার, সততা ইত্যাদি বিষয়েও দা'ওয়াত প্রদান করব? আমরা কি শুধু মানুষদের জন্যই দা'ওয়াত প্রদান করব? নাকি আমরা জীব-জানোয়ার, প্রকৃতি ও পরিবেশের কল্যাণেও দা'ওয়াত ও আদেশ নিষেধ করব?

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ঈমান, বিশ্বাস, ইবাদত, মু'আমালাত ইত্যাদি সকল বিষয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। সকল বিষয়ই দা'ওয়াতের বিষয়। কিছু বিষয় বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কিছু বিষয়ের মধ্যে দা'ওয়াতকে সীমাবদ্ধ করার অধিকার মুমিনকে দেওয়া হয় নি। তবে গুরুত্বগত পার্থক্য রয়েছে। 'দা'ওয়াতের সংবিধান' কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে যে বিষয়গুলির দা'ওয়াতে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, মুমিনও সেগুলির প্রতি বেশি গুরুত্ব প্রদান করবেন।

আমরা জানি যে, কুরআন ও হাদীসে প্রদত্ত গুরুত্ব অনুসারে মুমিন জীবনের কর্মগুলিকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। ফরয আইন, ফরয কিফায়া, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুসতাহাব, হারাম, মাকরূহ, মুবাহ ইত্যাদি পরিভাষাগুলি আমাদের নিকট পরিচিত। কিন্তু অনেক সময় আমরা "ফযীলতের" কথা বলতে যেয়ে আবেগ বা অজ্ঞতা বশত এক্ষেত্রে মারাত্মক ভুল করে থাকি। নফল-মুসতাহাব কর্মের দা'ওয়াত দিতে যেয়ে ফরয-ওয়াজিব কর্মের কথা ভুলে যায় বা অবহেলা করি। এছাড়া অনেক সময় 'মুসতাহাব'-এর ফযীলত বলতে যেয়ে 'হারাম' এর ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা বলা হয় না।

কুরআন-হাদীসের দা'ওয়াত পদ্ধতি থেকে আমরা দা'ওয়াত ও দীন

প্রতিষ্ঠার আদেশ নিষেধের বিষয়াবলীর গুরুত্বের পর্যায় নিম্নরূপ দেখতে পাই।

প্রথমত, তাওহীদ ও রিসালাতের বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন ও সর্ব প্রকার শিরক, কুফ্র ও নিফাক থেকে আত্মরক্ষা। সকল নবীর দা'ওয়াতের বিষয় ছিল প্রথমত এটি। কুরআন-হাদীসে এ বিষয়ের দা'ওয়াতই সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে। একদিকে যেমন তাওহীদের বিধানাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার দা'ওয়াত দেওয়া হয়েছে, তেমনি বারংবার শিরক, কুফ্র ও নিফাকের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

বর্তমান সময়ে দ্বীনের পথে দা'ওয়াতে ব্যস্ত অধিকাংশ "দা'য়ী" এই বিষয়টিতে ভয়ানকভাবে অবহেলা করেন। আমার চিন্তা করি যে, আমরা তো মুমিনদেরকেই দা'ওয়াত দিচ্ছি। কাজেই ঈমান-আকীদা বা তাওহীদের বিষয়ে দা'ওয়াত দেওয়ার বা শিরক-কুফ্র থেকে নিষেধ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। অথচ মহান আল্লাহ সূরা ইউসূফের ১০৬ আয়াতে বলেন:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ

"অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করে এবং সে অবস্থায় তারা শির্কে লিপ্ত থাকে।"

হাদীস শরীফে বারংবার মুমিনদেরকে শিরক-কুফ্র থেকে সাবধান করা হয়েছে। শিরক, কুফ্র ও নিফাক-মুক্ত বিশুদ্ধ তাওহীদ ও রিসালাতের ঈমান ছাড়া নামায, রোযা, দা'ওয়াত, জিহাদ, যিকির, তাযকিয়া ইত্যাদি সকল ফরয বা নফল ইবাদতই অর্থহীন। এজন্য শির্ক-কুফ্রীতে লিপ্ত ব্যক্তিকে নামায, রোযা, যিকির, দীন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির দা'ওয়াত দেওয়াও অর্থহীন।

দ্বিতীয়ত, বান্দার বা সৃষ্টির অধিকার সংশ্লিষ্ট হারাম বর্জন। আমরা জানি, ফরয কর্ম দু প্রকার: করণীয় ফরয ও বর্জনীয় ফরয। যা বর্জন করা ফরয তাকে "হারাম" বলা হয়। হারাম দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হারাম মানুষ ও সৃষ্টির অধিকার বা পাওনা নষ্ট করা বা তাদের কোনো ক্ষতি করা বিষয়ক হারাম। এগুলি বর্জন করা সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ।

পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তান, অধীনস্থ, সহকর্মী, প্রতিবেশী, দরিদ্র, এতিম ও অন্যান্য সকলের অধিকার সঠিকভাবে আদায় করা; কোনোভাবে কারো অধিকার নষ্ট না করা; কাউকে জুলুম না করা; গীবত না করা; ওজন, পরিমাপ ইত্যাদিতে কম না করা; প্রতিজ্ঞা, চুক্তি, দায়িত্ব বা আমানত আদায়ে অবহেলা না করা; হারাম উপার্জন থেকে আত্মরক্ষা করা; নিজের বা আত্মীয়দের বিরুদ্ধ হলেও ন্যায় কথা বলা ও ন্যায় বিচার করা; কাফির শত্রুদের পক্ষে হলেও ন্যায় বিচার করা ইত্যাদি বিষয় কুরআন ও হাদীসের

দা'ওয়াত ও আদশে নিষেধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এমনকি রাস্তাঘাটে, মাজলিসে, সমাজে বা পরিবেশে কাউকে কষ্ট দেওয়া এবং কারো অসুবিধা সৃষ্টি করাকেও হাদীস শরীফে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। সৃষ্টির অধিকার বলতে শুধু মানুষদের অধিকারই বুঝানো হয় নি। পশুপাখির অধিকার সংরক্ষণ, মানুষের প্রয়োজন ছাড়া কোনো প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলি অনেক সময় অবহেলিত। এমনকি অনেক 'দা'য়ী' বা 'দা'ওয়াতকর্মী'ও এ সকল অপরাধে জড়িত হয়ে পড়েন।

যে কোনো কর্মস্থলে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য কর্মস্থলের দায়িত্ব পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে সঠিকভাবে পালন করা ফর্য আইন। যদি কেউ নিজের কর্মস্থলে 'ফরয' সেবা গ্রহণের জন্য আগত ব্যক্তিকে 'ফরয' সেবা প্রদান না করে তাকে পরদিন আসতে বলেন বা তাকে একঘন্টা বসিয়ে রেখে 'চাশতের' নামায আদায় করেন বা দা'ওয়াতে অংশ গ্রহণ করেন তাহলে তিনি মুলত ঐ ব্যক্তির মত কর্ম করছেন, যে ব্যক্তি পাগড়ীর ফযীলতের কথায় মোহিত হয়ে লুঙ্গি খুলে উলঙ্গ হয়ে পাগড়ী পরেছে।

অধিকার ও দায়িত্ব বিষয়ক আদেশ নিষেধ কুর্আন-হাদীসে বেশি থাকলেও আমরা এ সকল বিষয়ে বেশি আগ্রহী নই। কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্যদেরকে কর্মস্থলে দায়িত্ব পালন ও আন্তরিকতার সাথে সেবা প্রদানের বিষয়ে দা'ওয়াত ও আদেশ নিষেধ করতে আমরা আগ্রহী নই। অবৈধ পার্কিং করে, রাস্তার উপর বাজার বসিয়ে, রাস্তা বন্ধ করে মিটিং করে বা অনুরূপ কোনোভাবে মানুষের কষ্ট দেওয়া, অপ্রয়োজনীয় ধোঁয়া, গ্যাস, শব্দ ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের বা জীব-জানোয়ারের কষ্ট দেওয়া বা প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা, দা'ওয়াত বা আদেশ-নিষেধ করাকে আমরা অনেকেই 'আল্লাহর পথে দা'ওয়াতের অবিচ্ছেদ্য অংশ' বলে মনে করি না। বরং এগুলিকে জাগতিক, দুনিয়াবী বা আধুনিক বলে মনে করি।

তৃতীয়তঃ পরিবার ও অধীনস্থদেরকে ইসলাম অনুসারে পরিচালিত করা।

"বান্দার হক্ক" বা মানবাধিকার বিষয়ক দায়িত্বসমূহের অন্যতম হলো নিজের দায়িত্বাধীনদেরকে দীনের দাওয়াত দেওয়া ও পথে পরিচালিত করা। দাওয়াত-কর্মী বা দা'য়ী নিজে যেমন এ বিষয়ে সতর্ক হবেন, তেমনি বিষয়টি দাওয়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গ্রহণ করবেন।

চতুর্থতঃ অন্যন্য হারাম বর্জন করা। হত্যা, মদপান, রক্তপান, শুকরের মাংস ভক্ষণ, ব্যভিচার, মিথ্যা, জুয়া, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, রিয়া ইত্যাদি এ জাতীয় হারাম। "দা'য়ী" বা দাওয়াত-কর্মী নিজে এসব থেকে নিজের কর্ম ও

হৃদয়কে পবিত্র করবেন এবং এগুলি থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য দা'ওয়াত প্রদান করবেন। আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন ও হাদীসে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বারংবার বিভিন্নভাবে এবিষয়ক দা'ওয়াত প্রদান করা হয়েছে।

পঞ্চমত, পালনীয় ফরয ওয়াজিবগুলি আদায় করা। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, হালাল উপার্জন, ফরয-আইন পর্যায়ের ইলম শিক্ষা ইত্যাদি এ জাতীয় ফরয ইবাদত এবং দাওয়াতের অন্যতম বিষয়।

ষষ্ঠত, সৃষ্টির উপকার ও কল্যাণমূলক 'সুন্নাত-নাফল' ইবাদত করা। সকল সৃষ্টিকে তার অধিকার বুঝে দেওয়া ফরয। অধিকারের অতিরিক্ত সকলকে যথাসাধ্য সাহায্য ও উপকার করা কুরআন-হাদীসের আলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ 'নফল' ইবাদত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সবচেয়ে সহজ ও প্রিয়তম পথ। ক্ষুধার্তকে আহার দেওয়া, দরিদ্রকে দারিদ্যমুক্ত করা, বিপদগ্রস্থকে বিপদ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করা, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং যে কোনোভাবে যে কোনো মানুষের বা সৃষ্টির কল্যাণ, সেবা বা উপকারে সামান্যতম কর্ম আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়। কুরআন ও হাদীসে এ সকল বিষয়ে বারংবার দা'ওয়াত ও আদেশ-নিষেধ করা হয়েছে।

সপ্তমত, আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যকার 'সুন্নাত-নফল' ইবাদত করা। নফল নামায, রোযা, যিকির, তিলাওয়াত, ফরয কিফায়া বা নফল পর্যায়ের দা'ওয়াত, তাবলীগ, জিহাদ, নসীহত, যিক্‌র, তাযকিয়া ইত্যাদি এ পর্যায়ের।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দা'ওয়াতে রত মুমিনগণ ষষ্ঠ পর্যায়ের নফল ইবাদতের চেয়ে সপ্তম পর্যায়ের নফল ইবাদতের দা'ওয়াত বেশি প্রদান করেন। বিশেষত, দারিদ্য বিমোচন, কর্মসংস্থান তৈরি, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসা সেবা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ের দা'ওয়াত প্রদানকে আমরা 'আল্লাহর পথে দা'ওয়াত' বলে মনেই করি না।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীব-জানোয়ারও যদি কোনো অন্যায় বা ক্ষতির কর্মে লিপ্ত থাকে সাধ্য ও সুযোগমত তার প্রতিকার করাও আদেশ নিষেধ ও কল্যাণ কামনার অংশ। যেমন কারো পশু বিপদে পড়তে যাচ্ছে বা কারো ফসল নষ্ট করছে দেখতে পেলে মুমিনের দায়িত্ব হলো সুযোগ ও সাধ্যমত তার প্রতিকার করা। তিনি এই কর্মের জন্য আদেশ, নিষেধ ও নসীহতের সাওয়াব লাভ করবেন। পূর্ববর্তী যুগের প্রাজ্ঞ আলিমগণ এ সকল বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেকেই এ সকল বিষয়কে 'আল্লাহর পথে দা'ওয়াত' বা দীন প্রতিষ্ঠার অংশ বলে বুঝতে পারেন না। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
পুরস্কার ও শাস্তি

২. ১. দা'ওয়াতের ফযীলত ও সাওয়াব

২. ১. ১. সাধারণ সাওয়াব ও বিশেষ সাওয়াব

উপরের আয়াত ও হাদীস থেকে আমরা সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ, দা'ওয়াত, দীন প্রচার বা দীন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বুঝতে পারছি। আমরা দেখছি যে, কাজটি মুমিনের জন্য একটি বড় ইবাদত। এ ইবাদত পালন করলে মুমিন নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদত পালনের ন্যায় সাওয়াব ও পুরস্কার লাভ করবেন। অবহেলা করলেও অনুরূপ ইবাদতে অবহেলার শাস্তি তার প্রাপ্য হবে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, কুরআন-হাদীসে দা'ওয়াত বা আদেশ-নিষেধের এ ইবাদতের জন্য অতিরিক্ত পুরস্কার ও শাস্তির কথা জানানো হয়েছে। পুরস্কারের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়: ১.সর্বোচ্চ পুরস্কার, ২. অন্যান্য অনেক মানুষের কর্মের সমপরিমাণ সাওয়াব ও ৩. জাগতিক গযব ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া।

২. ১. ২. সফলতা ও সর্বোচ্চ পুরস্কার

আমরা দেখেছি যে, দা'ওয়াত ও আদেশ-নিষেধের দায়িত্ব পালনকারীরাই সফলকাম বলে আল-ইমরানের ১০৪ আয়াতে বলা হয়েছে। সূরা নিসার ১১৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই দায়িত্ব পালনকারীর জন্য রয়েছে মহোত্তম পুরস্কার :

لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

"তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই। তবে যে দান, সৎকার্য ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের আদেশ দেয় তার পরামর্শে কল্যাণ আছে। আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য কেউ তা করলে তাকে মহা-পুরস্কার দিব।"

'দা'য়ী'র সর্বোচ্চ পুরস্কার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

وَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

"আল্লাহর কসম, তোমার মাধ্যমে যদি একজন মানুষকেও আল্লাহ সুপথ দেখান তাহলে তা তোমার জন্য সর্বোচ্চ সম্পদ লাল-উটের চেয়েও উত্তম বলে গণ্য হবে।" (বুখারী ও মুসলিম।)

অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন,

أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ

"ভাল কার্যে নির্দেশ করা সাদকা বলে গণ্য এবং খারাপ থেকে নিষেধ করা সাদকা বলে গণ্য।" (মুসলিম)

আমরা যারা সহজে মুখ খুলতে চাই না তাদের একটু চিন্তা করা দরকার। প্রতিদিন অগণিতবার আমার সুযোগ পাই মুখ দিয়ে মানুষকে একটি ভাল কথা বলার। লোকটি কথা শুনবে কিনা তা বিবেচ্য বিষয়ই নয়। আমি শুধু বলার সুযোগটা ব্যবহার করে সাওয়াব অর্জন করতে চাই। একটু ভালবেসে একটি ভাল উপদেশমূলক কথা আমার জন্য আল্লাহর দরবারে অগণিত পুরস্কার জমা করবে। সাথে সাথে লোকটিরও উপকার হতে পারে। যদি হয় তবে আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশেষ পুরস্কার লাভ করব।

২. ১. ৩. অগণিত মানুষের সমপরিমাণ সাওয়াব

দা'য়ী, মুবাল্লিগ বা দা'ওয়াত ও তাবলীগে রত ব্যক্তির বিশেষ পুরস্কারের দ্বিতীয় দিক হলো তার এই কর্মের ফলে যত মানুষ ভাল পথে আসবেন সকলের সাওয়াবের সমপরিমান সাওয়াব তিনি লাভ করবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

"যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ভালপথে আহ্বান করে তবে যত মানুষ তার অনুসরণ করবে তাদের সকলের পুরস্কারের সমপরিমাণ পুরস্কার সে ব্যক্তি লাভ করবে, তবে এতে অনুসরণকারীদের পুরস্কারের কোনো ঘাটতি হবে না। আর যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বিভ্রান্তির দিকে আহ্বান করে তবে যত মানুষ তার অনুসরণ করবে তাদের সকলের পাপের সমপরিমাণ পাপ সে ব্যক্তি লাভ করবে, তবে এতে অনুসরণকারীদের পাপের কোনো ঘাটতি হবে না।" (মুসলিম।)

মুমিন যদি কোনো একটি ভাল কর্ম করতে সক্ষম নাও হন, কিন্তু তাঁর নির্দেশনা-পরামর্শে কেউ তা করে, তবে তিনি কর্মকারীর সমপরিমান সাওয়াব পান। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেছেন,

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعله

"যদি কেউ কোনো ভাল কর্মের দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন তবে তিনি কর্মটি পালনকারীর সমপরিমান সাওয়াব লাভ করবেন।" (মুসলিম।)

২. ১. ৪. আযাব-গযব থেকে রক্ষা

দা'ওয়াত ও আদেশ-নিষেধের দায়িত্ব পালন করার অন্যতম পুরস্কার হলো জাগতিক গযব থেকে রক্ষা পাওয়া। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি সুন্দর উদাহরণের মাধ্যমে তা বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন,

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْمُدْهِنِ (الواقع) فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا يَصْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ فَيَصُبُّونَ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلاهَا فَقَالَ الَّذِينَ فِي أَعْلاهَا لا نَدَعُكُمْ تَصْعَدُونَ فَتُؤْذُونَنَا فَقَالَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا فَإِنَّا نَنْقُبُهَا مِنْ أَسْفَلِهَا (فِيْ نَصِيْبِنَا) فَنَسْتَقِي (وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا) فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ فَمَنَعُوهُمْ نَجَوْا جَمِيعًا وَإِنْ تَرَكُوهُمْ غَرِقُوا جَمِيعًا

"যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধিবিধান সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট এবং যে ব্যক্তি বিধিবিধান লঙ্ঘন করছে উভয়ের উদাহরণ হলো একদল মানুষের মত। তারা সমুদ্রে একটি জাহাজ বা বজরা ভাড়া করে। লটারীর মাধ্যমে কেউ উপরে এবং কেউ নিচের খোলে স্থান পায়। যারা নিচে অবস্থান গ্রহণ করল তারা পানি তোলার জন্য উপরে আসতে লাগল। এতে উপরের মানুষদের গায়ে পানি পড়তে লাগল। তখন উপরের মানুষেরা বলল, আমাদেরকে এভাবে কষ্ট দিয়ে তোমাদেরকে উপরে উঠতে দিব না। তখন নিচের মানুষেরা বলল, আমরা আমাদের অংশ বা জাহাজের নিচে একটি গর্ত করি, তাহলে আমরা সহজেই পানি নিতে পারব এবং উপরের মানুষদের কষ্ট দিতে হবে না। এই অবস্থায় যদি উপরের মানুষেরা তাদের এই কাজে বাধা দেয় এবং নিষেধ করে তাহলে তারা সকলেই বেঁচে যাবে। আর যদি তারা তাদেরকে এ কাজ করতে সুযোগ দেয় তাহলে তারা সকলেই ডুবে যাবে।" (বুখারী, তিরমিযী।)

নুবুয়তের নূর থেকে উৎসারিত এ উদাহরণটি ভাল করে চিন্তা করুন। সমাজের অনেক ক্ষমতাধর বা প্রভাবশালী মানুষ অনেক প্রকারের অন্যায় বা গর্হিত কাজ দেখেও প্রতিবাদ করেন না। তাঁরা জানেন যে, তাঁরা প্রতিবাদ করলে তা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তারা নীরবতা বা তাৎক্ষণিক সুবিধা অগ্রাধিকার দেন। তারা ভাবেন, এতে আমার তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। কষ্ট করছে অন্য মানুষেরা। নষ্ট হচ্ছে অন্য মানুষের সন্তানেরা। তাদের বুঝা উচিত যে, সমাজের এ অবক্ষয় কোনো না কোনাভাবে তাদের ও তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে স্পর্শ করবেই। এজন্য আমাদের সকলকেই আদেশ-নিষেধের এ দায়িত্ব পালনে সজাগ থাকতে হবে।

২. ২. দা'ওয়াতে অবহেলার শাস্তি

২. ২. ১. সাধারণ শাস্তি বনাম বিশেষ শাস্তি

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ বা এককথায় আল্লাহর পথে দা'ওয়াত একটি 'ফরয আইন' বা 'ফরয কিফায়া' ইবাদত। সাধারণভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, এ ইবাদত পালনে অবহেলা করলে এ জাতীয় অন্যান্য ইবাদত পালনে অবহেলার ন্যায় গোনাহ হবে। তবে কুরআন-হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এ ইবাদত পালনে

অবহেলা করার জন্য, বিশেষত, অন্যায় কাজ দেখে সাধ্যমত তার আপত্তি ও সংশোধন না করার জন্য বিশেষ ও কঠিন শাস্তি রয়েছে। শাস্তিগুলি নিম্নরূপ:

২. ২. ২. দুনিয়াবী গযব

কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, যুগে যুগে যারা তাঁদের সমাজের মানুষদেরকে অন্যায় পরিত্যাগ করতে আহ্বান করেছেন সে সব দা'য়ী ও মুবাল্লিগকে আল্লাহ্ গযব ও শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আর পাপীরা ও পাপের নীরব সমর্থক পুণ্যবানরা শাস্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছেন।

ইহূদীদের জন্য শনিবারে কোনোরূপ কর্ম করা নিষেধ ছিল। শনিবারে কোনো জেলে মাছ ধরত না। এজন্য নদীতে প্রচুর মাছ দেখা যেত। তাদের মধ্যকার একদল মানুষ হিলা বাহানা করে শনিবারে জাল ফেলে রাখতে শুরু করল, যেন রবিবারে মাছ ধরতে পারে। তখন ভাল মানুষদের একদল তাদের নিষেধ করেন এবং একদল বলেন, এসব মানুষের ধ্বংস অনিবার্য, এদের নিষেধ করে কি লাভ। এ প্রসঙ্গে সূরা আ'রাফের ১৬৪-১৬৫ আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ
يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

"স্মরণ কর, তাদের একদল বলেছিল, আল্লাহ্ যাদের ধ্বংস করবেন অথবা কঠোর শাস্তি দিবেন তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেন? তারা বলেছিল, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্ব-মুক্তির জন্য এবং হয়তবা তারা সাবধান হতে পারে। যে উপদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হলো, তখন যারা অসৎকার্য হতে নিষেধ করত তাদেরকে আমি রক্ষা করি এবং যারা যুলুম-অন্যায় করত তাদেরকে তাদের কুফুরীর কারণে কঠোর শাস্তি প্রদান করি।"

এখানে আমরা দেখছি যে, যারা অন্যায় থেকে নিষেধ করেছেন শুধু তাদেরকেই আল্লাহ্ গজব-শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। সূরা মায়িদার ৭৮-৭৯ আয়াতে ও সূরা হূদ-এর ১১৬ আয়াতেও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে।

উপরের আয়াত থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, "ওকে বললে কোনো লাভ হবে না" এরূপ ধারণা করে সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ থেকে বিরত থাকা জায়েয নয়। কারণ প্রথমত, 'লোকটি কথা শুনবে না' একথা নিশ্চিত জানলেও আমাকে বলতে হবে। আমার দায়িত্ব হলো বলা, আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতেই হবে। দ্বিতীয়ত, 'লোকটি কথা শুনবে না' এ কথা এভাবে নিশ্চিত ধারণা করাও ঠিক নয়। কারণ, হয়ত আন্তরিকাতপূর্ণ ভাল কথাটি তার মনে প্রভাব ফেলতে পারে।

দা'ওয়াতে অবহেলার জাগতিক শাস্তির বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ لا يُغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ

"যখন মানুষেরা অন্যায় দেখেও তা পরিবর্তন বা সংশোধন করবে না তখন যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহর শাস্তি তাদের সবাইকে গ্রাস করবে।" (তিরমিজী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ। সনদ সহীহ।)

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেন,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلا يُغَيِّرُوا إِلا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا.

"কোনো সমাজের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি অবস্থান করে সেখানে অন্যায়-পাপে লিপ্ত থাকে এবং সে সমাজের মানুষেরা তার সংশোধন-পরিবর্তন করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা পরিবর্তন না করে, তবে তাদের মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহর আযাব তাদেরকে গ্রাস করবে।" (আবু দাউদ। হাদীসটি হাসান।)

২. ২. ৩. দোয়া কবুল না হওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

"যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! তোমরা অবশ্যই কল্যাণের আদেশ করবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে, তা নাহলে আল্লাহ অচিরেই তোমাদের সবার উপর তাঁর গজব ও শাস্তি পাঠাবেন, তারপর তোমরা আল্লাহকে ডাকবে, কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেওয়া হবে না বা তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে না।" (তিরমিযী। হাসান)

২. ২. ৪. সামাজিক শান্তি, ঐক্য ও সম্প্রীতি নষ্ট হওয়া

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "ইসরাঈল সন্তানদের (ইহুদী জাতির) মধ্যে সর্বপ্রথম দুর্বলতা আসলো এভাবে যে, তাদের সমাজের একজন অপরজনকে (অন্যায় কাজে জড়িত) দেখলে বলত, আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং যা করছেন তা পরিত্যাগ করুন, একাজ আপনার জন্য বৈধ্য নয়। এরপর পরদিন তাকে অন্যায়ে লিপ্ত দেখত, কিন্তু (খারাপ লোকটির) অন্যায় তাকে (সৎ লোকটিকে) তার সাথে সামাজিক সম্পর্ক রাখতে বাধা দিত না। অন্যায়ে জড়িত থাকা সত্ত্বেও সে তার সাথে একত্রে উঠাবসা, খাওয়া-দা'ওয়া ও সামাজিকতা করত। যখন তারা এরূপ করতে লাগল, তখন আল্লাহ তাদের সামাজিক সম্প্রীতি ও ঐক্য নষ্ট করে দেন, তাদের মধ্যে বিভেদ, কলহ ও বৈরিতা সৃষ্টি করে দেন।"

একথা বলার পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কুরআন করীমের দুটি আয়াত (সূরা

মায়িদার ৭৮-৭৯ আয়াত) তেলাওয়াত করেন: "ইসরাঈল সন্তানদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছিল তারা দাউদ ও মরিয়ম পুত্র ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল, একারণে যে তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমা লঙ্ঘন করেছিল। তাদের মধ্যে সংঘটিত অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে তারা একে অপরকে নিষেধ করত না। তাদের এই আচরণ ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

كَلاَّ وَاللَّه لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوف وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ

"মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা অবশ্যই সৎকর্মের আদেশ করবে, অন্যায় থেকে নিষেধ করবে, অন্যায়কারী বা অত্যাচারীকে হাত ধরে বাধা দান করবে, তাকে সঠিক পথে ফিরে আসতে বাধ্য করবে এবং তাকে ন্যায় ও সত্যের মধ্যে থাকতে বাধ্য করবে। যদি তোমরা তা না কর তবে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা ও শত্রুতা সৃষ্টি করে দিবেন এবং তোমাদেরকে অভিশপ্ত করবেন যেমন ইসরাঈল সন্তানদেরকে অভিশপ্ত করেছিলেন।" (আবূ দাউদ ও অন্যান্য। সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।)

২. ২. ৫ পাপ ও অভিশাপ অর্জন

আদেশ-নিষেধের দায়িত্বে অবহেলাকারী নিজে পাপ না করেও অন্যের পাপের কারণে গোনাহ ও লানতের অংশীদার হন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه أَلا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لا مَا صَلَّوْا

"অচিরেই তোমাদের উপর অনেক শাসক-প্রশাসক আসবে যারা ন্যায় ও অন্যায় উভয় প্রকারের কাজ করবে। যে ব্যক্তি তাদের অন্যায়কে ঘৃণা করবে সে অন্যায়ের অপরাধ থেকে মুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি আপত্তি করবে সে (আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে) নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে এ সকল অন্যায় কাজ মেনে নেবে বা তাদের অনুসরণ করবে (সে বাঁচতে পারবে না।)" সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বলেন, "না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে।" (মুসলিম।)

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا وَقَالَ مَرَّةً أَنْكَرَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا

"যখন পৃথিবীতে কোনো পাপ সংঘটিত হয় তখন পাপের নিকট উপস্থিত

থেকেও যদি কেউ তা ঘৃণা করে বা আপত্তি করে তবে সে ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির মত পাপমুক্ত থাকবে। আর যদি কেউ অনুপস্থিত থেকেও পাপটির বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকে বা মেনে নেয় তাহলে সে তাতে উপস্থিত থাকার পাপে পাপী হবে।" (আবু দাউদ। সনদ গ্রহণযোগ্য।)

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لاَ تَقِفَنَّ عِنْدَ رَجُلٍ يُقْتَلُ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ حِيْنَ لَمْ يَدْفَعُوْا عَنْهُ وَلاَ تَقِفَنَّ عِنْدَ رَجُلٍ يُضْرَبُ مَظْلُوْماً فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ

"যেখানে কোনো মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে সেখানে কখনই দাঁড়াবে না; কারণ সেখানে উপস্থিত লোকেরা যদি তার হত্যা প্রতিরোধ না করে তাহলে সকলের উপরে লানত ও অভিশাপ বর্ষিত হয়। যেখানে কোনো মানুষকে অত্যাচার করে মারধর করা হচ্ছে সেখানে দাঁড়াবে না। কারণ উপস্থিত সকলের উপরেই লানত-অভিশাপ বর্ষিত হয়।"

(আহমদ, তাবারানী, বাইহাকী। বাইহাকীর সনদটি হাসান বলে ইরাকী এহইয়াউ উলূমিদ্দীনের তাখরীজে উল্লেখ করেছেন।)

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

لا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرًا لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالا ثُمَّ لا يَقُولُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ فَيَقُولُ رَبِّ خَشِيتُ النَّاسَ فَيَقُولُ وَأَنَا أَحَقُّ أَنْ يُخْشَى.

"তোমাদের কেউ যেন নিজেকে ছোট না করে। সে যদি দেখে যে কোথাও কোনো বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কোনো কথা বলা উচিত তখন যেন সে কথা বলা থেকে বিরত না থাকে। তাহলে আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি এ বিষয়ে কেন কথা বল নি? সে বলবে, হে আল্লাহ, আমি মানুষদেরকে ভয় পেয়েছিলাম। তখন তিনি বলবেন, আমার অধিকারই তো বেশি ছিল যে, তুমি আমাকেই বেশি ভয় করবে।" (আহমদ। সনদ সহীহ।)

সমাজের বিভিন্ন প্রকাশ্য অন্যায়, জুলুম, গণপিটুনি, বেহায়াপনা, অশ্লীল নাচগান, জুয়া, খুনখারাবি, মারামারি-দাঙ্গা ইত্যাদির নীরব দর্শক হওয়ার ভয়াবহ পরিণতি আমরা এ হাদীস থেকে বুঝতে পারছি। এ সকল ক্ষেত্রে সাধ্যমত দাওয়াত দেওয়ার ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করার চেষ্টা করতে হবে। না হলে দ্রুত এরূপ স্থান পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার ও অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করার তাওফীক দান করুন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দা'ওয়াতের শর্ত ও দা'য়ীর গুণাবলী

উপরের আলোচনা থেকে আমরা নসীহত, প্রচার, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ বা এককথায় আল্লাহর পথে দা'ওয়াত-এর গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এখন আমাদের দেখতে হবে, এ দায়িত্ব পালনের জন্য শর্তাবলী কি? 'দায়ী' ও 'মুবাল্লিগ' অর্থাৎ 'দা'ওয়াত দানকারী' ও 'প্রচারকের' মধ্যে কি কি গুণাবলী বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন? কারণ শরীয়ত সম্মতভাবে দায়িত্ব পালন না করলে আমরা ভাল কাজ করতে যেয়ে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ব।

৩. ১. ইলম বা জ্ঞান

দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রথম শর্ত হলো, ন্যায়, অন্যায়, সেগুলির পর্যায় এবং সেগুলির প্রতিবাদ-প্রতিকারের ইসলামী পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। আমি যে কাজ করার বা বর্জন করার দা'ওয়াত দিচ্ছি তা সত্যিই ইসলামের নির্দেশ কিনা তা জানতে হবে। ভালমন্দ অনেক ক্ষেত্রে সকল মানুষই বিবেক ও জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারেন। খুন, জুলুম, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি, মারামারি, নেশাকরা, ইত্যাদি অগণিত অন্যায় কাজকে অন্যায় বলে জানতে বেশি জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। অনুরূপভাবে মানুষকে সাহায্য করা, সান্তনা দেওয়া, সৃষ্টির কল্যাণে এগিয়ে আসা ইত্যাদি ভাল কাজ বলে সবাই বুঝি। কিন্তু ইসলামী কর্মকাণ্ড বা ধর্মীয় নির্দেশনা বিষয়ক অগণিত বিষয় রয়েছে যে সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে নিজেই অন্যায়ে লিপ্ত হবেন। অথবা সৎকার্যে আদেশ দান করতে যেয়ে অসৎকার্যে আদেশ করবেন।

যেমন একব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কর্ম করছেন বা স্ত্রী-সন্তানদের প্রতিপালনের জন্য জরুরী কর্ম করছেন। কাজটি তার জন্য ফরয্ আইন। আপনি তাকে এই 'দুনিয়াবী' কাজ বর্জন করে 'নফল' বা 'ফর্য কিফায়া' পর্যায়ের মাহফিল, মিছিল, মিটিং বা দা'ওয়াতে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান করলেন। অথবা একব্যক্তি ওজরের কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করছেন দেখে আপনি তাকে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করলেন। উভয় ক্ষেত্রে আপনি ন্যায় করতে যেয়ে অন্যায়ে লিপ্ত হলেন। এরূপ অগণিত উদাহরণ আমরা দেখতে পাব। এজন্য ধর্মীয় বিধিবিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ক্ষেত্রে মুমিনের উচিত বিষয়টি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বা অন্যায় তা স্পষ্টভাবে না জেনে হটকারিতায় লিপ্ত না হওয়া।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে স্পষ্ট জ্ঞানের অত্যাবশ্যকতা বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন:

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

"বল, এটিই আমার পথ। স্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর দিকে আহ্বান

করি আমি এবং আমার যারা অনুসারী।" (সূরা ইউসূফ ১০৮ আয়াত)

এ স্পষ্ট জ্ঞান হলো ওহীনির্ভর জ্ঞান বা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা। সূরা আম্বিয়ার ৪৫ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ

"বল, আমি তো শুধু ওহীর ভিত্তিতেই তোমাদেরকে ভয়প্রদর্শন করছি।"

সূরা আহকাফের ৯ আয়াতে ও অন্যান্য স্থানে একই কথা বলা হয়েছে।

এজন্য দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালনকারীকে কুরআন ও হাদীসের আলোকে স্পষ্টরূপে জানতে হবে, যে কাজ করতে বা বর্জন করতে তিনি দা'ওয়াত দিচ্ছেন তার শর'য়ী বিধান কী এবং তা পালন বা বর্জনের দা'ওয়াতের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর শেখানো পদ্ধতি কী। কাজটি সৎকর্ম হলে তা ফরয, ওয়াজিব, মুসতাহাব ইত্যাদি কোন্ পর্যায়ের এবং অসৎকর্ম হলে হারাম, মাকরূহ ইত্যাদি কোন্ পর্যায়ের তা স্পষ্ট কুরআন ও হাদীসের আলোকে জানতে হবে। ওহীর স্পষ্ট নির্দেশনা ব্যতীত সাধারণ ধারণা, আবেগ আন্দাজ ইত্যাদির ভিত্তিতে কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম বলতে কুরআন কারীমে নিষেধ করা হয়েছে। সূরা নাহ্ল-এর ১১৬ আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে,

وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ

"তোমাদের জিহ্বা দ্বারা মিথ্যা আরোপ করে (মনগড়াভাবে) বলবে না যে, এটি হালাল ও এটি হারাম। এভাবে আল্লাহর নামে মিথ্যা উদ্ভাবন করা হবে। যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তারা সফল হয় না।"

দা'য়ী ও মুবাল্লিগকে অবশ্যই সর্বদা বেশি বেশি কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, ও অন্যান্য ইসলামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে হবে। আরবী না বুঝলে অনুবাদের সাহায্য নিতে হবে। কুরআন-হাদীস বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আলিমদের রচিত গ্রন্থাদি পড়ে দীনকে জানার চেষ্টা করা কঠিন অন্যায় এবং কুরআন-হাদীসে প্রতি অবহেলা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন। মহান আল্লাহ কুরআনকে সকল মানুষের হেদায়েতরূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি তা বুঝা সহজ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উম্মাতের জন্য তাঁর মহান সুন্নাত ও হাদীস রেখে গিয়েছেন। এগুলির সার্বক্ষণিক অধ্যয়ন মুমিনের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত, শ্রেষ্ঠতম যিকির ও দা'ওয়াতের প্রধান হাতিয়ার।

৩. ২. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা ও আন্তরিকতা

আদেশ-নিষেধ, নসীহত, প্রচার বা আল্লাহর পথে আহ্বান করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হলো, যাকে আদেশ করছি, নিষেধ করছি বা আহ্বান

করছি তার প্রতি হৃদয়ের ভালবাসা ও আন্তরিক মঙ্গলকামনা। এজন্যই দা'ওয়াতের এ কর্মকে কুরআন ও হাদীসে 'নসীহত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, নসীহতের মূল অর্থ আন্তরিক ভালবাসা ও মঙ্গল কামনা। আল্লাহর পথে আহ্বান কারী বা আদেশ-নিষেধকারী কারো ভুল ধরে দেওয়া, নিজের জ্ঞান প্রদর্শন বা নিজের 'মাতব্বরি' প্রতিষ্ঠার জন্য এই কাজ করবেন না। বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি হৃদয়ের ভালবাসার টানেই এ দায়িত্ব পালন করবেন।

অন্যায়ে লিপ্ত বা বিভ্রান্ত যে ব্যক্তিকে তিনি দা'ওয়াত দিচ্ছেন তার প্রতি তার হৃদয়ের অনুভুতি হবে বিপদগ্রস্থ আপনজনের মত। যার বিপদে তিনি ব্যাথা অনুভব করছেন এবং যাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য হৃদয়ের আকুতি অনুভব করছেন। তাকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিলে যদি সে তা না মানে বা বিরোধিতা করে তবে আহ্বানকারী মুমিনের হৃদয়ে ক্রোধ বা প্রতিহিংসা জাগ্রত হবে না, বরং বেদনা ও দুশ্চিন্তা তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করবে। বেদনায় তার হৃদয় দুমড়ে মুচড়ে উঠবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ অবস্থার কথা আল্লাহ কুরআন কারীমে একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন। সূরা কাহ্ফ-এর ৬ আয়াতে বলেছেন,

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

"তারা এই বাণীতে বিশ্বাস না করলে সম্ভবত আপনি তাদের পিছনে ঘুরে দুঃখ-বেদনায় নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবেন।"

সূরা শু'আরা-এর ৩ আয়াতেও অনুরূপ বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পবিত্র জীবনে এই ভালবাসা ও প্রেমের অগণিত উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। যে কাফিরগণ তাঁর দেহকে রক্তরঞ্জিত করছে তাদেরই জন্য তিনি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ও করুণা প্রার্থনা করছেন। তিনি তাঁর কপালের রক্ত মুছছেন এবং বলছেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ

"হে আমার প্রতিপালক, আমার জাতিকে আপনি ক্ষমা করে দিন, কারণ তারা জানে না।" (বুখারী, মুসলিম, ফাতহুল বারী।)

মক্কাবাসীদের অত্যাচারে জর্জরিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তায়েফে যেয়ে পেলেন নির্মমতম অত্যাচার। সে সময়ে জিবরাঈল (আ) পাহাড়ের ফিরিশতাকে নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করে বলেন, আপনার অনুমতি হলে পাহাড় উঠিয়ে এ জনপদকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কঠিনতম কষ্টের সে মুহূর্তেও তিনি বলেন,

بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

"না। বরং আমি আশা করি যে, আল্লাহ হয়ত এদের ঔরস থেকে এমন মানুষের জন্ম দেবেন যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে

কিছু শরিক করবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

সুবহানাল্লাহ! কত বড় ধৈর্য! কত মহান প্রেম!! আমরা যারা সামান্য বিরোধিতায় উত্তেজিত হয়ে গালাগালি করি ও প্রতিশোধের পরিকল্পনায় বিভোর হই তাদের একটু চিন্তা করা দরকার!

৩. ৩. ব্যক্তিগত আমল

'দা'য়ী ইলাল্লাহ' বা আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ও আদেশ-নিষেধকারী অবশ্যই তাঁর প্রচারিত আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী ও পালনকারী হবেন। সারা বিশ্বে যিনি আল্লাহর দীন ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আদর্শের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা দেখতে চান, তাকে সর্ব প্রথমে তার ব্যক্তিজীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল দিকে এ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, নিজের জীবনে আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেয়ে অন্যকে দা'ওয়াত দেওয়া অনেক বেশি সহজ ও আকর্ষণীয় কাজ। এজন্য শয়তান এবং মানবীয় প্রবৃত্তির কাছে তা খুবই প্রিয়। এর শাস্তিও খুব কঠিন।

ইহূদীগণ সর্বদা ধর্ম ও মানবতার বিষয়ে সবচেয়ে আকর্ষণীয় আদর্শের বুলি আউড়ায় কিন্তু নিজেরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করে। মহান আল্লাহ সূরা বাকারার ৪৪ আয়াতে এরশাদ করেছেন,

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ

"তোমরা কি মানুষদেরকে সৎকার্যে নির্দেশ দাও আর নিজেদের কথা ভুলে যাও! অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর! তবে কি তোমরা বুঝ না।"

দ্বীনের দা'ওয়াত ও প্রতিষ্ঠার কাজে লিপ্ত অনেকেই বুঝে অথবা না বুঝে এ অপরাধে অপরাধী। ইসলামের দা'ওয়াত ও প্রতিষ্ঠার কথা বললেও ব্যক্তিগত ইবাদত, আচরণ, পারিবারিক সম্পর্ক, স্ত্রী, সন্তান, পিতামাতা, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, কর্মস্থল, সহকর্মী ও অন্যান্য মানুষের অধিকার আদায় ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত দুর্বল। এদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। দু পর্যায়ে আমরা এ অপরাধে লিপ্ত হই:

প্রথমত, যে কার্যের জন্য আদেশ বা নিষেধ করছি তা আমরা নিজেরাই পালন বা বর্জন করছি না। যেমন আমরা প্রতিবেশীর অধিকার পালন অথবা সুদ বর্জনের দা'ওয়াত দিচ্ছি, কিন্তু নিজেরাই প্রতিবেশীর অধিকার নষ্ট করছি বা সুদে লিপ্ত রয়েছি।

দ্বিতীয়ত, আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাধী না হলেও, অন্যান্য সমপর্যায়ের অপরাধে লিপ্ত রয়েছি। যেমন আমরা সুদ খাচ্ছি না, তবে ঘুষ, যৌতুক, কর্মে ফাঁকি, ভেজাল ইত্যাদি অপরাধে লিপ্ত আছি।

সূরা সাফ্ফ-এর ২-৩ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ

"হে মুমিনগণ, তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক যে, তোমরা যা কর না তা বলবে।"

সূরা বাকারাহ-এর ২০৪ আয়াত ও সূরা মুনাফিকূন-এর ৪ আয়াতেও আমরা কথা ও কর্মের বৈপরীত্যের কঠিন নিন্দা দেখতে পাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.

"কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনয়ন করে জাহান্নামের অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনে তার নাড়িভুড়ি বেরিয়ে পড়বে এবং গাধা যেমন যাতা (ঘানি) নিয়ে ঘুরে তেমনি সে ঘুরতে থাকবে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট সমবেত হয়ে বলবে, হে অমুক, তোমার কি হল? তুমি না আমাদেরকে সৎকার্যে আদেশ দিতে এবং অসৎকার্য থেকে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎকার্যে আদেশ দিতাম কিন্তু নিজে করতাম না। আর আমি তোমাদেরকে অসৎকার্য থেকে নিষেধ করতাম, কিন্তু নিজেই তা করতাম।" (বুখারী)

আমরা মহান আল্লাহর নিকট এরূপ করুণ পরিণতি থেকে আশ্রয় চাই।

৩. ৩. ১. ব্যক্তিগত আমলে ত্রুটি সহ দা'ওয়াতের বিধান

উপরের আয়াত ও হাদীস থেকে বুঝতে পারছি যে, নিজে পালন না করে অন্যকে দা'ওয়াত দেওয়া অন্যায়। তবে দা'ওয়াত বা আদেশ-নিষেধ ফরয আইন পর্যায়ের হলে নিজের আমলে ত্রুটি থাকলেও আদেশ নিষেধ করতে হবে। যেমন একব্যক্তি ধূমপান করেন বা ঠিকমত জামাতে নামাজ পড়েন না। তিনি তার অধীনস্থ বা পরিবারের সদস্য কাউকে এ পাপে লিপ্ত দেখলে তার জন্য তাকে আদেশ বা নিষেধ করা ফরয-আইন দায়িত্ব হয়ে যাবে। এ অবস্থায় আদেশ-নিষেধ না করলে তিনি দ্বিতীয় একটি অন্যায় ও অপরাধের মধ্যে পতিত হবেন।

৩. ৪. বিনম্রতা ও বন্ধুভাপান্নতা

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অন্যতম মৌলিক শর্ত হলো বিনম্রতা ও বন্ধুভাবাপন্নতা। আমরা অনেক সময় সৎকার্যে আদেশ বা অন্যায় থেকে নিষেধ করাকে ব্যক্তিগত অহং প্রতিষ্ঠার পর্যায়ে নিয়ে যায়। ফলে আমরা কথা বলি 'মাতব্বরি' ভঙ্গিতে যা

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের অহংবোধে আঘাত করে এবং আমাদের কথা গ্রহণ করতে বাধা দেয়। এরপর যখন সে তা গ্রহণ না করে বা আমাদের বিরুদ্ধে খারাপ কথা বলে তখন আমরা তাকে 'ইসলামের শত্রু' আখ্যায়িত করে কঠিনভাবে তার বিরুদ্ধে আক্রোশমূলক কথা বলি। এগুলি সবই কঠিন অন্যায় এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে দূরে সারিয়ে দেওয়ার পথ। আমরা অনেক সময় 'গরম' কথা বা 'কড়া' কথা বলাকে সাহসিকতা ও 'জিহাদ' বলে মনে করি। অথচ আল্লাহ কুরআন কারীমে 'নরম' কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ 'হক্ক' কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু 'গরম' কথা বলতে কখনো নির্দেশ দেননি। হক্ক কথাকে নরম করে বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। বিশ্বের অন্যতম তাগূত খোদাদ্রোহী জালিম ফিরাউনের কাছে মূসা ও হারূন (আ) কে প্রেরণ করে তিনি নরম কথার নির্দেশ দিয়ে বলেন:

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

"তোমর উভয়ে ফিরাউনের নিকট গমন কর, সে অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে বা ভয় করবে।" (সূরা তাহা ৪৩-৪৪ আয়াত)

এ যদি হয় কাফিরকে দা'ওয়াত দেওয়ার বা আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণের প্রতি নির্দেশ, তাহলে যারা কালিমা পড়েছেন, মুসলিম বলে নিজেকে মনে করছেন তাদেরকে আদেশ নিষেধ করার ক্ষেত্রে আমাদের আরো কত বিনম্র ও বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া উচিত তা একটু চিন্তা করুন।

সূরা আন'আমের ১০৮ আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

"তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিবে না; কারণ ফলে তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে।"

এ যদি হয় কাফিরদের দেবদেবীর ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ, তাহলে কালিমা পাঠকারী মুসলিম বলে পরিচিত ব্যক্তিকে আদেশ নিষেধ করতে যেয়ে তাকে, তার ভ্রান্ত বা জাগতিক মতের নেতা বা সাথীদেরকে গালি দেওয়া কিভাবে বৈধ হবে? গালাগালি, কঠোরতা, হিংসা, ঘৃণা, গীবত, অহংকার ইত্যাদি দ্বারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাতে মূলত নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হবে, কোনো ইবাদত পালন করা হবে না। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

সম্মানিত পাঠক, দা'ওয়াত বা সৎকাজের নির্দেশনা ও অসৎকাজের নিষেধ-এর উদ্দেশ্য মানুষের উপরে মাতব্বরি করা বা মানুষের ভুল ধরা নয়। বরং মানুষদেরকে সৎপথে আহ্বান করা এবং যথাসম্ভব মানুষকে ভাল পথে আসতে সাহায্য করা। এজন্য সর্বোচ্চ বিনম্রতা, ভদ্রতা ও ধৈর্য প্রয়োজন।

সবচেয়ে বড় 'দা'য়ী' ও আদেশ-নিষেধকারী ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। আর তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বিনম্রতা। বিনম্রতা ও ধৈর্যের অনুপম আদর্শ দিয়ে তিনি জয় করেছিলেন অগণিত বেদুঈন আরবের কঠিন হৃদয়। অস্ত্র বা শক্তি দিয়ে তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন নি। অনুপম চরিত্র ও ভালবাসাময় আদেশ-নিষেধ বা দা'ওয়াত দিয়ে হৃদয়গুলিকে জয় করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন মদীনার রাষ্ট্র। এরপর সে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা করেছেন যুদ্ধের মাধ্যমে। মহান আল্লাহ সূরা আল-ইমরানের ১৫৯ আয়াতে হৃদয় জয়ের এ কাহিনী বিদ্ধৃত করে বলেছেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

"আল্লাহর দয়ার অন্যতম প্রকাশ যে আপনি তাদের প্রতি বিনম্র কোমল-হৃদয় ছিলেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন তাহলে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত।"

একটি হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন,

إِنَّ يَهُودَ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلَيْكُم (السَّامُ) وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ) وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ. قَالَتْ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ (أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ) قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ

কতিপয় ইহূদী নবী (ﷺ)-এর নিকট আগমন করে বলে, আস-সামু আলাইকুম (আপনার উপর মরণ-অভিশাপ)। আয়েশা রাগন্বিত হয়ে বলেন, তোমাদের উপর মরণ, তোমাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত করুন এবং তোমাদের উপর তার ক্রোধ অবতীর্ণ হোক। তখন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "আয়েশা, শান্ত হও। তুমি অবশ্যই সর্বদা বিনম্রতা ও বন্ধুভাবাপন্নতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ সকল বিষয়ে বিনম্রতা ও বন্ধুভাবাপন্নতা ভালবাসেন। আর খবরদার! কখনই তুমি উগ্রতা ও অভদ্রতার নিকটবর্তী হবে না।" আয়েশা বলেন, "তারা কী বলেছে আপনি কি তা শুনেন নি?" তিনি বলেন, "আমি কী বলেছি তা কি তুমি শোন নি? আমি বলেছি, 'ওয়ালাইকুম' অর্থাৎ তোমাদের উপরে।" (বুখারী, মুসলিম)

৩. ৫. উত্তম দিয়ে মন্দ প্রতিহত করা

দা'ওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ধৈর্য, ক্ষমা ও উত্তম ব্যবহারের দ্বারা খারাপ আচরণের প্রতিরোধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ। সূরা হা মীম সাজদা (ফুস্সিলাত) এর ৩৩-৩৫ আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ

كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

"কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। (মন্দ) প্রতিহত কর উৎকৃষ্টতর (আচরণ) দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এ গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এ গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা মহা সৌভাগ্যবান।"

সূরা মুমিনূন-এর ৯৬ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন:

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ

"মন্দের মুকাবিলা কর যা উৎকৃষ্টতর তা দিয়ে, তারা যা বলে আমি সে সম্পর্কে বিশেষ অবহিত।"

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে গালির প্রতিবাদে গালি, নিন্দার প্রতিবাদে নিন্দা, রাগের প্রতিবাদে রাগ ইত্যাদি নিষিদ্ধ। এসব 'মন্দ' আচরণের প্রতিরোধ করতে হবে উৎকৃষ্টতর আচরণ দিয়ে। অথচ আমরা অনেক সময় এই নির্দেশের বিপরীত কর্ম করি। কেউ প্রতিবাদ করলে বা খারাপ আচরণ করলে আমরা তার আচরণের চেয়ে 'নিকৃষ্টতর আচরণের' মাধ্যমে তার 'প্রতিবাদ'! বা 'প্রতিরোধ'!! করি।

৩. ৬. সুন্দর ব্যবহার ও আচরণ

দায়ী বা সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধকারীকে অবশ্যই তাঁর নেতা রাসূলুল্লাহর (ﷺ) মত মহোত্তম আচরণের অধিকারী হতে হবে। আরবীতে একে খুলুক (خلق) বা আখলাক বলা হয়। বাংলায় সাধারণত একে 'চরিত্র' বলা হয়। তবে চরিত্র বলতে বাংলায় সাধারণত মানুষের নৈতিক পবিত্রতা বুঝানো হয়। আর আরবীতে 'আখলাক' শব্দ আরো প্রশস্ত। মানুষের সাথে মানুষের আচরণ ও ব্যবহারের সামগ্রিক অবস্থাকেই আরবীতে 'খুলুক' বলা হয়। এজন্য খুলুক বা আখলাক-কে বাংলায় 'আচরণ' বা 'ব্যবহার' বলাই উত্তম।

মহান আল্লাহ সূরা কালাম-এর ৪ আয়াতে এরশাদ করেছেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

"আর নিশ্চয় আপনি মহান আচরণ ও ব্যবহারের উপরে অধিষ্ঠিত।"

এ মহান আচরণের বিভিন্ন দিক রয়েছে। উপরে উল্লিখিত বিনম্রতা, বন্ধুভাবাপন্নতা, উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ প্রতিহত করা ইত্যাদিও এই 'খুলুকে আযীম' বা 'মহান আচরন'-এর অংশ। তবে এর আরো বিভিন্ন দিক রয়েছে যা 'দা'য়ী ইলাল্লাহ'-কে অর্জন করতে হবে। শুধু দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের

প্রতিটি ক্ষেত্রে এ ব্যবহার বা আচরণ আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর জীবনকে আলোকিত করবে এবং তার চারিধারে ফুলের সৌরভ ছড়াবে।

মহানবী (ﷺ)-এর মহান আচরণের বিভিন্ন দিক বিস্তারিত আলোচনা করতে পৃথক গ্রন্থ প্রয়োজন। এখানে কয়েকটি দিক উল্লেখ করা যায় :

১. সর্বাবস্থায় অশ্লীল কথা, অশালীন কথা, গালিগালাজ ও কটুক্তি বর্জন করা। বিভিন্ন হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে,

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلا مُتَفَحِّشًا، وَلاَ لَعَّاناً وَلاَ سَبَّاباً

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অশালীন, অশ্লীল, অশোভনীয় কথা বলতেন না, গালি দিতেন না, কটুক্তি করতেন না।" (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

২. বেশি কথা বলা, দম্ভভরে বা চিবিয়ে কথা বলা, অহঙ্কার করা, বিতর্ক করা, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি পরিহার করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ

"তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় এবং কেয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থানের অধিকারী হবে তারা যারা তোমাদের মধ্যে সবচেয় উত্তম আচরণের অধিকারী। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত এবং কেয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করবে তারা যারা বেশি কথা বলে, যারা কথা বলে জিতে যেতে চায়, বাজে কথা বলে এবং যারা অহঙ্কার করে।" (তিরমিযী। হাদীসটি হাসান।)

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.

"নিজের মতটি হক্ক হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বিতর্ক পরিত্যাগ করল আমি তার জন্য জান্নাতের পাদদেশে একটি বাড়ির যিম্মাদারী গ্রহণ করলাম। আর যে ব্যক্তি হাসি-মশকরার জন্যও মিথ্যা বলে না আমি তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বাড়ির যিম্মাদারী গ্রহণ করলাম। আর যার আচরণ-ব্যবহার সুন্দর আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি বাড়ির যিম্মাদারি গ্রহণ করলাম।" (আবু দাউদ। হাসান। সহীহুল জামি।)

৩. সকলের সাথে আনন্দিত চিত্তে হাসিমুখে কথা বলা এবং কথার সময় পরিপূর্ণ মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে তার কথা শোনা। যেন তার প্রতি ভালবাসা ও আন্তরিকতা পূর্ণভাবে ফুটে উঠে। আমর ইবনুল আস (রা) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَى شَرِّ الْقَوْمِ يَتَأَلَّفُهُ بِذَلِكَ.

وَكَانَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيْثِهِ عَلَيَّ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّيْ خَيْرُ الْقَوْمِ.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সমাজের নিকৃষ্টতম ব্যক্তির সাথেও পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তার দিকে পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে কথা বলতেন। এভাবে তিনি তার হৃদয় জয় করে নিতেন। তিনি আমার সাথেও কথা বলতেন পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে এবং আমার দিকে পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে। এমনকি আমার মনে হতো আমিই সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ।" (তাবারানী। হাসান।)

এখানে উল্লেখ্য যে, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, শ্রদ্ধাবোধ এবং অহঙ্কারহীন হৃদয় না হলে এগুণ পুরোপুরি অর্জন করা যায় না।

উত্তম আচরণ শুধু দা'ওয়াতের সফলতার চাবিকাঠিই নয়, উপরন্তু আখেরাতের সফলতার সর্বোত্তম উপায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ.

"কিয়ামতের দাড়িপাল্লায় উত্তম আচরণের চেয়ে বেশি ভারি কোনো আমল আর রাখা হবে না। আর উত্তম আচরণের অধিকারী ব্যক্তি এ আচরণের দ্বারাই তাহাজ্জুদ ও নফল রোযা পালনকারী মর্যাদা অর্জন করবে।" (তিরমিযী, আহমদ, আবূ দাউদ। সহীহ। সহীহুল জামি।)

৩. ৭. সবর বা ধৈর্য

উপর্যুক্ত গুণগুলি অর্জন করতে ধৈর্যের অনুশীলন করতে হবে। পূর্বোল্লিখিত একটি আয়াতে আমরা দেখেছি যে, 'উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ প্রতিহত' করার গুণ শুধু ধৈযশীলগণই অর্জন করতে পারেন এবং তারাই মহা সৌভাগ্যবান। দাওয়াত ও ধৈর্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সূরা লুকমানের ১৭ আয়াতে আল্লাহ বলেন:

أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ

"সালাত কায়েম কর, সৎকার্যে আদেশ কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যা নিপতিত হয় তাতে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় এগুলিই দৃঢ়সংকল্পের কাজ।"

সূরা আল-ইমরানের ১৮৬ আয়াতে এবং সূরা আল-আসরেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধৈর্যের মূল পরিচয় হলো রাগের সময়। আল্লাহর পথে ডাকতে বা ভাল কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধ করতে গেলেই অনেক মানুষের নিকট থেকে বিরূপ কথা, গালিগালাজ, নিন্দা ইত্যাদি শুনতে হবে এবং এতে কখনো প্রচণ্ড রাগ হবে এবং কখনো মন দুঃখভারাক্রান্ত হবে। উভয় ক্ষেত্রেই আমাদেরকে ধৈর্যের মাধ্যমে এর মুকাবিলা করতে হবে এবং উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ

প্রতিহত করতে হবে। কুরআন কারীমে বারংবার মুমিনদেরকে ধৈর্য অবলম্বন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ করা এবং ক্রোধ সম্বরণ করাকে মুমিনদের মৌলিক পরিচয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর পথে টিকে থাকার জন্য ধৈর্য ও সালাতের সাহায্য গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কাফিরদের নিন্দামন্দ, মিথ্যা-অপবাদ, বিদ্রূপ কথা ও ষড়যন্ত্রের মুকাবিলায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়ে সূরা নাহ্ল-এর ১২৭-১২৮ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

"ধৈর্য ধারণ কর, আর তোমার ধৈর্য তো আল্লাহর সাহায্য ছাড়া হবে না। আর তাদের দরুন দুঃখ করবে না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুন্ন হবে না। আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করেন এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।"

৩. ৮. সালাত, তাসবীহ ও ইবাদত

ধৈর্য অর্জনের অত্যন্ত বড় অবলম্বন হলো সালাত বা নামায ও দোয়া। কুরআন কারীমে একাধিক স্থানে ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে শক্তি অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা হিজর-এর ৮৭-৯৯ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

"আমি তো জানি, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। সুতরাং তোমার প্রতিপালকের তাসবীহ-তাহমীদ বা প্রশংসাময় পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর। এভাবেই তোমার একীন এসে যাবে।"

আল্লাহর পথে ডাকতে গেলে বা সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ করতে গেলে মানুষের বিরোধিতা, শত্রুতা ও নিন্দার কারণে কখনো ক্রোধে কখনো বেদনায় অন্তর সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। এ মনোকষ্ট দূর করার ও প্রকৃত ধৈর্য ও মানসিক স্থিতি অর্জন করার উপায় হলো বেশি বেশি আল্লাহর যিক্র, তাসবীহ, তাহমীদ ও সালাত আদায় করা। সাজদায় যেয়ে আল্লাহর দরবারে ক্রন্দন ও প্রার্থনা করা। এভাবেই আমরা 'মন্দকে উৎকৃষ্ট দিয়ে প্রতিহত' করার প্রকৃত গুণ অর্জন করতে পারব। আমরা (Re-active) না হয়ে (Pro-active) হতে পারব। কারো আচরণের প্রতিক্রিয়া আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করবে না। আল্লাহর রেযামন্দীর দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা আচরণ করতে পারব। আমরা সত্যিকার অর্থে মহা-সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারব। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি

৪. ১. বিভিন্ন অজুহাতে এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা

অনেক সময় আমরা বিভিন্ন অজুহাতে দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে থাকি। কখনো মনে করি, বলে আর কি হবে, ওরা তো শুনবে না। কখনো ভাবি, আখেরী যামানা, এখন আর বলে লাভ নেই। এসকল চিন্তা শয়তানী ওয়াসওয়াস ছাড়া কিছুই নয়। উপরের আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, "বললে শুনবে না" এ কারণে বলা থেকে বিরত থাকা জায়েয নয়। মুমিনের দায়িত্ব শুনানো নয়, মুমিনের দায়িত্ব বলা।

উপরের আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনা কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুমিনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কোন্ যুগ সর্বশেষ তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। হক্ক ও বাতিলের সংঘাত কিয়ামত পর্যন্তই চলবে। বাতিলের প্রাধান্য দেখে বিচলিত হয়ে বালিতে মুখ গোঁজার অনুমতি মুমিনকে দেওয়া হয়নি। নির্দিষ্ট কোনো সময়ে আদেশ-নিষেধ ও দা'ওয়াতের এই দায়িত্ব রহিত হবে বলে জানানো হয়নি। সকল যুগেই সাধ্যমত সংশোধন ও পরিবর্তনের চেষ্টা মুমিনের উপর অর্পিত দায়িত্ব।

শুধু একটি ক্ষেত্রে মুমিনের জন্য আদেশ, নিষেধ বা দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন ফরয হবে না বলে আলিমগণ উল্লেখ করেছেন। তা হলো, নিশ্চিত ক্ষতি বা জুলুমের ভয়। সূরা বাকারাহ-এর ১৯৫ আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"এবং তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاءِ لِمَا لا يُطِيقُ

"মুমিনের উচিত নয় নিজেকে অপমানিত করা।" সাহাবীগণ বলেন, কিভাবে সে নিজেকে অপমানিত করবে? তিনি বলেন, "নিজেকে এমন বিপদাপদের মুখে ফেলবে যা সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই।" (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আবু ইয়ালা, তাবারানী। সহীহ । মাজমাউয যাওয়াইদ ৭/২৭২-২৭৫)

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا

وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعِ الْعَوَامَّ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ قَالَ بَلْ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ

"তোমরা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করতে থাক। অবশেষে যখন দেখবে যে, সর্বত্র মানুষ জাগতিক লোভলালসার দাস হয়ে গিয়েছে, প্রত্যেকেই নিজ প্রবৃত্তির মর্যিমাফিক চলছে, দুনিয়াবী স্বার্থ সর্বত্র প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকেই তার নিজের মতকে সর্বোত্তম বলে বিশ্বাস করছে, তখন তুমি নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত হবে এবং সাধারণ মানুষের বিষয় ছেড়ে দেবে। কারণ তোমাদের সামনে রয়েছে এমন কঠিন সময়, যখন ধৈর্য ধারণ করাও আগুনের অঙ্গার মুঠি করে ধরার মত কষ্টদায়ক হবে। সে সময়ে যারা কর্ম করবে তারা তোমাদের মত যারা কর্ম করে তাদের ৫০ জনের সমান পুরস্কার লাভ করবে।" সাহাবীগণ বলেন, "আমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সাওয়াব না তাদের মধ্যকার?" তিনি বলেন, "না, বরং তোমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সমপরিমাণ সাওয়াব।" (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান, হাকিম। সহীহ।)

উপরের আয়াত ও হাদীসগুলির আলোকে আলিমগণ উল্লেখ করেছেন যে, মুমিন যদি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারেন যে, আদেশ, নিষেধ বা দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে গেলে জুলুম বা অপমানের শিকার হতে হবে, অথবা গৃহযুদ্ধ, পরস্পর হানাহানি ও চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে তার কথা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটাবে, তবে তিনি তা পরিত্যাগ করতে পারেন।

এক্ষেত্রে চারিটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে :

প্রথমত, উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, মানুষের ভয়ে হক্ক কথা বলা পরিত্যাগ করলে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। এজন্য সামান্য ভয় বা অনিশ্চিত আশঙ্কার কারণে এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা ঠিক নয়।

দ্বিতীয়ত, যদি মুমিন ক্ষতি বা অপমান সম্পর্কে নিশ্চিত হন তাহলে তাকে অবশ্যই সেস্থান পরিত্যাগ করা উচিত। আমরা উপরে কয়েকটি হাদীসে দেখেছি যে, যেখানে অন্যায় সংঘটিত হয় সেখানে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা না থাকলে মুমিনের দায়িত্ব হলো অবিলম্বে সেস্থান পরিত্যাগ করা, নইলে তাকেও অভিশাপ ও গযবের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

তৃতীয়ত, সম্ভব হলে, বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ও সমস্যার মধ্যেও সাধ্যমত এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ এ পরিস্থিতিতে মুমিনের পুরস্কার বৃদ্ধি পাবে। বিশৃঙ্খল কঠিন সামাজিক পরিস্থিতিতে ভীতি ও ক্ষতির মধ্যেও যারা ধৈর্য ধারণ করে সাহাবীদের মত দা'ওয়াত ও আদেশ-নিষেধের কাজ করতে পারবেন

তাঁদের একজন ৫০ জন সাহাবীর সমান সাওয়াব ও পুরস্কার পাবেন।

চতুর্থত, সর্বাবস্থায় অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা ও অন্যায় অপসারণের জন্য হৃদয়ের আকুতি মুমিনের জন্য 'ফরয আইন'। অন্যায়কে মেনে নেওয়া, 'এমন তো হতেই পারে' বা 'ওদের কাজ ওরা করছে আমি কি করব' ইত্যাদি চিন্তা করে নির্বিকার থাকা বা অন্যায়ের প্রতি মনোকষ্ট অনুভব না করা ঈমান হারানোর লক্ষণ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) শিক্ষার অবমাননা যে মুমিনকে পীড়া না দেয় তার ঈমানের দাবী অসার।

৪. ২. কঠোরতা, উগ্রতা বা সীমালঙ্ঘন

আমরা দেখেছি যে, দা'ওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কঠোরতা বা উগ্রতা নিষিদ্ধ। মহান প্রভু যিনি মুমিনের উপর দা'ওয়াতের দায়িত্ব অর্পন করেছেন, তিনিই তাকে এক্ষেত্রে নম্রতার নির্দেশ দিয়েছেন। নামাযের জন্য তিনি পবিত্রতার নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই পবিত্রতা ছাড়া নামায আদায় করলে তাতে আল্লাহর ইবাদত হবে না, মনগড়া কাজ করা হবে। তেমনি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে নম্রতা ও 'উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ প্রতিহত' না করলে আল্লাহর ইবাদত করা হবে না, বরং প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হবে। চরম উস্কানির মুখেও মু'মিনকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং 'উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ প্রতিহত' করতে হবে। যদি কেউ নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায় রাগারাগি, কঠোরতা, উগ্রতা বা সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত হন তবে তিনি নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা মেটাবেন মাত্র, আল্লাহর ইবাদত করা হবে না।

প্রতিটি মানুষকেই আল্লাহ 'ফিত্‌রাত'-এর উপর সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকের মধ্যেই 'ভাল' আছে। পরিবেশের ফলে অনেকের মধ্যে তা বীজ বা চারা রূপেই রয়ে গিয়েছে, পরিচর্যার অভাবে তা বৃক্ষ বা নিয়ন্ত্রক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারেনি। সমাজের সবচেয়ে খারাপ মানুষটির মধ্যেও ভালর বীজ সুপ্ত রয়েছে। উগ্রতা, কঠোরতা, সমালোচনা বা গালাগালির বুলডোজার দিয়ে সে বীজ বা চারাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা দা'য়ীর কাজ নয়। দা'য়ীর দায়িত্ব হলো ভালবাসা, বিনম্রতা ও আন্তরিকতার পরিচর্যা দিয়ে মানুষের মধ্যকার কল্যাণমুখিতার বীজ বা চারাকে বৃক্ষে রূপান্তরিত করা।

৪. ৩. ফলাফল প্রাপ্তির ব্যস্ততা

সঠিক জ্ঞানের অভাব ও আবেগের প্রভাবে আমরা যে সকল বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হতে পারি তার অন্যতম হলো, ফলাফল লাভের জন্য ব্যস্ততা বা ফলাফলের ভিত্তিতে দা'ওয়াতের সফলতা বিচার। দা'ওয়াত বা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব পালন করছি, আমরা ফলাফল সন্ধান করছি না। অনেক সময় আবেগী মুমিনের মনে ফলাফললাভের উন্মাদনা তাকে বিপথগামী করে ফেলে।

আমরা চাই যে, সমাজ থেকে ইসলাম বিরোধী ও মানবতা বিরোধী সকল অন্যায় ও পাপ দূরীভুত হোক। কোনো মুমিনের মনে হতে পারে যে, এত ওয়ায, বক্তৃতা, বইপত্র, আদেশ নিষেধ ইত্যাদিতে কিছুই হলো না, কাজেই তাড়াতাড়ি কিভাবে সব অন্যায় দূর করা যায় তার চিন্তা করতে হবে। এ চিন্তা তাকে অবৈধ বা ইসলামে অনুমোদিত নয় এমন কর্ম করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কুমন্ত্রণা দিতে পারে।

মহান আল্লাহ্ সূরা মায়িদার ১০৫ আয়াতে বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

"হে মুমিনগণ, তোমদের উপরে শুধু তোমাদের নিজেদেরই দায়িত্ব। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।"

তাহলে আমাদের দায়িত্ব হলো নিজের হেদায়াত। আর নিজের হেদায়াত-এর অংশ হলো দীনের প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা। আমাদের আদেশ-নিষেধ সত্ত্বেও যদি কেউ বা সকলেই বিপথগামী হয় তবে সেজন্য আমাদের কোনো পাপ হবে না বা আমাদেরকে আল্লাহর দরবারে দায়ী হতে হবে না। অনেক নবী শতশত বছর দা'ওয়াত ও আদেশ নিষেধ করেছেন, কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউ সুপথপ্রাপ্ত হয় নি। এতে তাঁদের মর্যাদার কোনো কমতি হবে না বা তাঁদের দায়িত্ব পালনে কোনো কমতি হয়নি। কাজেই মুমিন কখনোই ফলাফলের জন্য ব্যস্ত হবেন না। বরং নিজের দায়িত্ব কুরআন ও হাদীসের আলোকে পালিত হচ্ছে কিনা সেটাই বিবেচনা করবেন।

বর্তমান যুগে দ্বীনের কাজে লিপ্ত মানুষেরাও জড়বাদী-বস্তুবাদী চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। আমরা আল্লাহর ইবাদতের সাফল্যও দুনিয়াবী ফলাফল দিয়ে বিচার করতে চাই। অথচ ইসলামের মূল শিক্ষাই হলো আখেরাতমুখিতা। দুনিয়াতে আল্লাহ কি ফলাফল দিবেন সেটা তাঁরই ইচ্ছা। মুমিনের চিন্তা হলো তার ইবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হলো কিনা এবং সে আখেরাতে তার পুরস্কার পাবে কিনা। মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি দয়া কর আমাদেরকে দুনিয়ামুখিতা থেকে রক্ষা করেন এবং আমাদের হৃদয়গুলিকে আখেরাতমুখি করে দেন।

৪. ৪. দা'ওয়াতের অজুহাতে ব্যক্তিগত আমলে ত্রুটি

সঠিক জ্ঞানের অভাব ও আবেগের প্রভাবে কেউ কেউ অন্যকে ভাল করার আশায় নিজে পাপে লিপ্ত হন বা নিজের নেককর্মে অবহেলা করেন। কখনো ফর্য আইন বাদ দিয়ে ফর্য কিফয়া পালন করেন। কখনো অন্যকে ভাল করার জন্য নিজে গোনাহ করেন এবং কখনো অন্যের ভালর আশায় নিজের ব্যক্তিগত নফল মুস্তাহাব আমলে অবহেলা করেন।

৪. ৪. ১. ফরযে আইন বাদ দিয়ে ফরযে কিফায়া পালন করা

আমরা দেখেছি যে, দা'ওয়াত, আদেশ, নিষেধ বা দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক দায়িত্ব ও ফরযে কিফায়া। প্রত্যেক জনগোষ্টীর

সংশ্লিষ্ট কিছু মানুষ এ দায়িত্ব পালন করলে বাকীদের জন্য তা নফলে পরিণত হয়। যিনি এই দায়িত্ব পালন করবেন তিনি এর মহান সাওয়াব ও মর্যাদা অর্জন করবেন। কিন্তু অন্যদের কোনো গোনাহ্ হবে না। পক্ষান্তরে, পিতামাতার খেদমত, স্ত্রী-সন্তানদের ভরণপোষণ, তাদের পূর্ণ মুসলিমরূপে প্রতিপালন, কর্মস্থলের চুক্তি পালন ইত্যাদি মুসলিমের জন্য ফরয আইন। দা'ওয়াতের অগণিত সাওয়াব ও ফযীলতের কথা শুনে বা বিশ্বে ইসলামকে বিজয়ী করার আবেগে যদি আমরা আমাদের 'ফরয আইন' ইবাদতগুলিতে অবহেলা করে ফরয কিফায়া বা নফল পর্যায়ের দা'ওয়াত, আদেশ বা নিষেধে রত হই তাহলে তা আমাদের ধ্বংস ও ক্ষতির পথ প্রশস্ত করবে।

৪. ৪. ২. ওয়াজিব-সুন্নাত বর্জন করা বা হারাম-মাকরূহে লিপ্ত হওয়া

নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও অপরের প্রতি আমার দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য বুঝা আমাদের জন্য জরুরী। অনেক সময় দ্রুত ফলাফল লাভের চিন্তা মুমিনকে অন্যের ভাল করার প্রচেষ্টায় নিজে অন্যায় করতে প্ররোচিত করে। যেমন একজন মদ খাচ্ছেন। তাকে দা'ওয়াত দেওয়ার জন্য আমি তার সাথে বলে কিছু মদ পান করি। অথবা একজন বেপর্দা মহিলাকে দওয়াত দেওয়ার জন্য আমিও নিজের পর্দা নষ্ট করি। এভাবে দা'ওয়াতের নামে সিনেমা ইত্যাদি দেখা, জামাতে নামায নষ্ট করা, দাড়ি কাটা বা অন্য কোনো শরীয়ত নিষিদ্ধ বা আইন বিরুদ্ধ কাজ করা সবই এ পর্যায়ের। অনেক সময় শয়তানী প্ররোচনায় মুমিন এগুলিকে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে 'হিকমাত' ও প্রজ্ঞা বলে মনে করতে পারেন। আসলে বিষয়টি বিভ্রান্তি। 'হিকমাতের' অর্থ দা'ওয়াত গ্রহণকারীর মানসিক প্রস্তুতির আলোকে শরীয়ত অনুসারে দা'ওয়াত প্রদান। নিজে পাপে লিপ্ত হওয়া বা নিজের নেক আমল নষ্ট করা কখনোই হিকমত নয়, বরং নফসানিয়্যত ও প্রবৃত্তির অনুসরণ।

৪. ৪. ৩. ব্যক্তিগত নফল-মুস্তাহাব ইবাদতে ত্রুটি করা

অনেক সময় আবেগের বশবর্তী হয়ে মুমিন দা'ওয়াত বা আদেশ নিষেধের জন্য তাহাজ্জুদ, যিক্‌র, তিলাওয়াত ও অন্যান্য সুন্নাত-মুসতাহাব ইবাদত পালনে ত্রুটি করেন। মুমিনের মনে হতে পারে, আগে দা'ওয়াত, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদির মাধ্যমে দ্বীনের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা করে এরপর আমি আমার ব্যক্তিগত তাকওয়া, সুন্নাত, তাহাজ্জুদ, যিকির, তাযকিয়া ইত্যাদি বিষয়ে নযর দিব। অথবা আমি তো সবচেয়ে বড় কাজে লিপ্ত রয়েছি কাজেই অন্য নেক আমল না করলেও চলে। বিষয়টি ওয়াসওয়াসা এবং ভুল বুঝা ছাড়া কিছুই নয়।

এখানে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখা দরকার:

প্রথমত, ফরযে আইন ইবাদতে ত্রুটি করে ফরযে কিফায়া বা নফল ইবাদত বৈধ নয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পিতামাতার খেদমত ত্যাগ করে আল্লাহর পথে জিহাদে শরীক হতে অনুমতি দেন নি, যদিও জিহাদের ফযীলত অকল্পনীয়।

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও মহান সাহাবীগণের জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, দ্বীনের দা'ওয়াত ও প্রতিষ্ঠার কারণে তারা ব্যক্তিগত তাযকিয়া, নফল ইবাদত, তাহাজ্জুদ, যিক্‌র, ক্রন্দন ইত্যাদির সামান্যতম কমতি করেন নি।

তৃতীয়ত, দ্বীনের দা'ওয়াত ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ফাইনাল পর্যায় বলে কিছু নেই। এটি একটি স্থায়ী ও চলমান প্রক্রিয়া। হক্ক ও বাতিলের সংঘাত কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। বিজয়ের চাকা এদিকে ওদিকে ঘুরবে। কাজেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমার দা'ওয়াত ও দীনপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব থেমে যাবে এবং আমি অন্য কাজে মনোযোগ দিতে পারব, এরূপ চিন্তা ওয়াসওয়াসা ও বিভ্রান্তি মাত্র।

চতুর্থত, অগণিত নবী-রাসূল, মুজাহিদ ও 'দায়ী ইলাল্লাহ' তাঁদের আজীবন কর্ম করেও জাগতিক ফলাফল দেখে যান নি। তাঁরা কখনোই উপরের ওয়াসওয়াসার প্রভাবে নিজেদের ব্যক্তিগত ফরয দায়িত্ব বা ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক ও তাযকিয়ার বিষয়ে ত্রুটি করেন নি।

পঞ্চমত, মুমিনের কাজ দুইটি। আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক গভীর করা ও অন্য মানুষদেরকে দা'ওয়াত ও আদেশ নিষেধের মাধ্যমে এই পথে আহ্বান করা। প্রথম কাজটির গুরুত্ব দ্বিতীয় কাজটির চেয়ে অনেক বেশি। কারণ প্রথম কাজে বান্দা নিজের ইচ্ছায় এগোতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের ফলাফল বান্দার নিজের ইচ্ছার মধ্যে নয়। কাজেই কেউ যদি দ্বিতীয় কর্মের ফলাফল লাভের উপর প্রথম কর্ম বন্ধ করে রাখেন তাহলে তার আখিরাতের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দান করুন।

৪. ৫. দা'ওয়াত ও সংশোধন বনাম বিচার ও শাস্তি

সঠিক জ্ঞানের অভাবে ও আবেগের প্রভাবে যে কঠিন ভুল ঘটে যেতে পারে তা হলো আদেশ-নিষেধের নামে বিচার-শাস্তি প্রদান। আদেশ-নিষেধ ও বিচার শাস্তির মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতা অনুসারে অন্যায় পরিবর্তন বা বন্ধ করা মুমিনের দায়িত্ব। কিন্তু অন্যায় বন্ধ করা ও অন্যায়ের বিচার-শাস্তি দেওয়া সম্পূর্ণ দুইটি পৃথক দায়িত্ব। প্রথমটি সকল মুসলিমের করণীয়। আর বিচার ও শাস্তি একমাত্র রাষ্ট্রের অধিকার ও দায়িত্ব। রাষ্ট্র যেন তার উপর অর্পিত সঠিক বিচার-শাস্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করে সে জন্য মুমিন যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মুমিনকে বিচার নিজ হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়নি। এজন্য ইমাম আহমদ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অন্যায়ের পরিবর্তন হাত দিয়ে করতে বলেছেন, তরবারী বা অস্ত্র দিয়ে নয়। (আল-কানযুল আকবার ১/৭৮)

অতীত বা ভবিষ্যত অন্যায় বা অসৎ কাজের জন্য ওয়ায নসীহত বা উপদেশ দিতে হবে। আর বর্তমানে কাউকে অন্যায়ে লিপ্ত দেখতে পেলে সম্ভব হলে তাকে বিরত করতে হবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই বিচারের দয়িত্ব হাতে

তুলে নেওয়া যাবে না। নিম্নের উদাহরণ থেকে আমরা তা বুঝতে পারব।

মদপান বা মাদক দ্রব্য গ্রহণ একটি কঠিন পাপ ও অন্যায়। ইসলামী শরীয়তে এর শাস্তি বেত্রাঘাত। যদি কোনো মুমিন কোথাও কাউকে মদপান বা নেশাগ্রহণ করতে দেখেন তাহলে তার দায়িত্ব হলো তা বন্ধ করার চেষ্টা করা। তিনি সম্ভব হলে তাকে শক্তি দিয়ে একাজ থেকে বিরত করবেন। না হলে তাকে বিরত হতে উপদেশ দিবেন। না হলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবেন এবং এই পাপ বন্ধ হোক তা কামনা করবেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তিনি মদপানকারীর বিচার করতে পারবেন না বা শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি দিতে পারবেন না।

অনুরূপভাবে ব্যভিচার, ধর্মত্যাগ, খুন, চুরি ইত্যাদি কঠিন পাপ। ইসলামে এগুলির শাস্তি বেত্রাঘাত, মৃত্যুদণ্ড বা হস্তকর্তন। কোনো মুমিন কাউকে এসকল পাপে লিপ্ত দেখতে পেলে তিনি উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে তা বন্ধ করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তিনি কোনো অবস্থাতেই তার বিচার বা শাস্তি প্রদান করতে পারবেন না। বিচার ও শাস্তির জন্য ইসলামে নির্ধারিত প্রক্রিয়া রয়েছে। সাক্ষ্য, প্রমান, আত্মপক্ষ সমর্থন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার বাইরে শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাষ্ট্রপ্রধান বা বিচারকেরও নেই।

উমার (রা) আব্দুর রাহমান ইবনু আউফকে (রা)-কে বলেন, "আপনি শাসক থাকা অবস্থায় যদি কাউকে ব্যভিচার বা চুরির অপরাধে রত দেখতে পান তাহলে তার বিচারের বিধান কী? (নিজের দেখাতেই কি বিচার করতে পারবেন?)" আব্দুর রাহমান (রা) বলেন, "আপনার সাক্ষ্যও একজন সাধারণ মুসলিমের সাক্ষ্যের সমান।" উমার (রা) বলেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন।" (বুখারী)

অর্থাৎ স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানও নিজের দেখার ভিত্তিতে বিচার করতে পারবেন না এবং তাঁর একার সাক্ষ্যেও বিচার হবে না।

অন্য এক ঘটনায় উমার (রা) রাত্রে মদীনায় ঘোরাফেরা করার সময় একব্যক্তিকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পান। তিনি পরদিন সকালে সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাউকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পান তাহলে তিনি কি শাস্তি প্রদান করতে পারবেন? তখন আলী (রা) বলেন, কখনোই না। আপনি ছাড়া আরো তিনজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী যদি অপরাধের সাক্ষ্য না দেয় তাহলে আপনার উপরে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। (আল-কানযুল আকবার ১/২২৭)

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো দেখা ও শোনার মধ্যে পার্থক্য। কোনো অন্যায় সংঘটিত হতে দেখলে সাধ্যমত তা পরিবর্তন বা প্রতিবাদ-প্রতিকার করতে হবে। কিন্তু যদি কোথাও অন্যায় হচ্ছে শুনে সেখানে যেয়ে দেখা গেল যে, অন্যায় সংঘটিত হয়ে গিয়েছে। এখন আর কেউ তাতে লিপ্ত নেই। এই অবস্থায় বিষয়টি বিচার্য বিষয়ে পরিণত হবে। এক্ষেত্রে কোনো মানুষ কোনো অবস্থাতেই 'অমুক কিছুক্ষণ আগে অমুক অপরাধে লিপ্ত ছিল' বলে তাকে বিচার করতে পারবেন না বা শাস্তি দিতে পারবেন না। প্রয়োজন ও সুযোগ অনুসারে উপদেশ-নসীহত করবেন বা আইনে সোপর্দ করবেন।

অনেক সময় 'সঠিক বিচার হবে না', বা 'শরীয়ত সম্মত বিচার হবে না' এ চিন্তা কাউকে বিচার হাতে তুলে নেওয়ার জন্য প্ররোচিত করতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের আবারো মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দায়িত্ব হলো, আদেশ, নিষেধ ও আহ্বান। বিচার করা বা সকল অন্যায় মিটিয়ে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব নয়। সঠিক বিচার বা ইসলাম সম্মত বিচার না থাকলে তা প্রতিষ্ঠার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সাধ্যমত আদেশ-নিষেধ করা বা তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই বিচার হাতে তুলে নেওয়ার কোনো অধিকার আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে দেন নি। দা'ওয়াতের পরেও যদি সঠিক বিচার না হয় বা শরীয়ত বিরোধী বিচার হয় তবে সেজন্য সংশ্লিষ্টরা আল্লাহর নিকট অপরাধী হবেন এবং "দা'য়ী"গণ বিমুক্ত থাকবেন। সঠিক বিচার হবে না মনে করে গণপিটুনি, ভাংচুর বা আইন হাতে তুলে নেওয়া কঠিন অন্যায় ও হারামসমূহের অন্যতম। লোকটি সত্যিকার অপরাধী কিনা, কতটুকু অপরাধী এবং এই অপরাধে ইসলামে তার শাস্তি কি, তা নির্ধারণ করার জন্য শরীয়তের সঠিক প্রক্রিয়ার বাইরে কিছু করার অর্থই হলো জুলুম। আর পূর্বের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, এতে অংশগ্রহণ তো দূরের কথা, এখানে উপস্থিত থাকলেও লানতের ভাগী হতে হবে।

৪. ৬. আদেশ-নিষেধ বনাম গীবত-অনুসন্ধান

কুরআন-হাদীসের জ্ঞানের অভাবে ও আবেগের প্রভাবে আমরা আরেকটি ভুল করি। আমরা আদেশ-নিষেধের নামে পরচর্চা ও দোষ খোঁজায় লিপ্ত হই। আদেশ-নিষেধ এবং পরনিন্দা ও গোপন দোষ সন্ধানের মধ্যে পার্থক্য আসমান ও যমিনের। প্রথমটি ফরয ইবাদত এবং দ্বিতীয়টি হারাম কবীরা গুনাহ।

মহান আল্লাহ যেমন অসৎ ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি তিনি অন্যের গোপন অন্যায় বা দোষ খোঁজ করতে নিষেধ করেছেন। যে অন্যায় প্রকাশ্যে আপনি দেখতে পাবেন, আপনি প্রকাশ্যে তার প্রতিবাদ-প্রতিকার করবেন। আপনি যে অন্যায় কাজটি দেখতে পেয়েছেন তা যদি অন্যেরা না দেখে তাহলে আপনি অন্যায়কারীকে ভয়প্রদর্শন বা আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা করুন। একান্ত বাধ্য না হলে বা মানবাধিকার বা হক্কুল ইবাদ সংশ্লিষ্ট না হলে বিষয়টি আইন বা জনসমক্ষে তুলবেন না।

কারো দোষ গোপনে সন্ধান করা বা গোপন দোষ জানার চেষ্টা করা হারাম। অনুরূপভাবে কারো কোনো গোপন অন্যায় বা দোষের কথা জানলে তা প্রকাশ না করে গোপন রাখা এবং গোপনেই তাকে নসীহত করা হাদীসের নির্দেশ। সর্বোপরি কারো দোষের কথা তার অনুপস্থিতিতে আলোচনা করা গীবত বা পরচর্চা এবং তা কঠিন হারাম। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কারো অন্যায়ের কথা মানুষের কাছে বলে বেড়ানোর নাম সৎকাজে আদেশ বা অসৎকাজে নিষেধ করা নয়। বরং এই কাজটিই একটি অসৎকাজ। আল্লাহ

তা'লা সূরা হুজুরাত-এর ১২ আয়াতে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

"হে মুমিনগণ তোমরা অধিকাংশ অনুমান-ধারণা পরিত্যাগ কর; কারণ কোনো কোনো অনুমান-ধারণা পাপ। এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের অনুপস্থিতিতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

"খবরদার! তোমরা অবশ্যই অনুমান-ধারণা থেকে বহুদূরে থাকবে। কারণ অনুমান ধারণাই হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা। এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় জানার চেষ্টা করবে না, গোপন দোষ সন্ধান করবে না, পরস্পরে হিংসা করবে না, পরস্পরে বিদ্বেষে লিপ্ত হবে না এবং পরস্পরে শত্রুতা ও সম্পর্কচ্ছেদ করবে না। তোমরা পরস্পরে ভাইভাই আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও।" (বুখারী ও মুসলিম।)

এভাবে আমরা জানতে পারছি যে, অনুমানে কথা বলা এবং অন্যের দোষ অনুসন্ধান করা হারাম। শুধু তাই নয়, অনুসন্ধান ছাড়াও যদি অন্যের কোনো দোষত্রুটি মানুষ জানতে পারে তা তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ করা গীবত ও হারাম। গীবত হলো ১০০% সত্য কথা। কোনো ব্যক্তির ১০০% সত্য দোষত্রুটির কথা তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ করার নামই গীবত। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা কি জান গীবত বা অনুপস্থিতের নিন্দা কী? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (ﷺ) ভাল জানেন। তিনি বলেন, তোমার ভাইকে তার অনুপস্থিতিতে এমনভাবে উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে। তখন প্রশ্ন করা হলো, বলুন তো, আমি যা বলছি তা যদি সত্যই আমার ভাইয়ের মধ্যে বিরাজমান হয় তাহলে কি হবে? তিনি বলেন, তুমি যা বলছ তা যদি সত্যই

তার মধ্যে বিরাজমান থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তুমি তার মিথ্যা অপবাদ করলে।" (মুসলিম।)

আমরা ভাবি, সত্য কথা বলব তাতে অসুবিধা কি? আমরা হয়ত বুঝি না বা প্রবৃত্তির কুমন্ত্রনায় বুঝতে চাই না যে, সব সত্য কথা জায়েয নয়। অনেক সত্য কথা মিথ্যার মত বা মিথ্যার চেয়েও বেশি হারাম। আবার কখনো বলি, আমি এ কথা তার সামনেও বলতে পারি। আর সামানে যা বলতে পারেন তা পিছনে বলাই তো গীবত।

গীবত অর্থাৎ অন্যের দোষক্রটি তার অনুপস্থিতিতে আলোচনা করা অত্যন্ত আনন্দদায়ক কর্ম। মানবীয় প্রবৃত্তি তা খুবই পছন্দ করে। কুরআনে এজন্য একে 'গোশত খাওয়ার' সাথে তুলনা করা হয়েছে। গোশত খাওয়া খুবই মজাদার, তবে নিজ মৃতভাইয়ের গোশত খাওয়া মজাদার নয়, ঘৃণ্য কাজ। কুরআনের নির্দেশনা যার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করেছে সেই মুমিন অনুভব করেন যে, গীবতের মাধ্যমে তিনি মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করছেন। এজন্য কাজটি তাঁর কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য। কিন্তু আমরা দুবৃল ঈমানের অধিকারীরা তা বুঝতে পারি না। বরং ভুনা গরুর গোশতের মতই পরিতৃপ্তির সাথে আমরা তা ভক্ষণ করি।

মানব প্রবৃত্তির কাছে গীবতের মজাদার হওয়ার দুইটি কারণ। **প্রথমত,** নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া বিরক্তিকর। অন্যের দোষ আলোচনা করলে এ বিরক্তি থেকে বাঁচা যায়। **দ্বিতীয়ত,** নিজের ভালত্ব, ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সহজ উপায় গীবত। নিজের বড়ত্ব নিজে বলা একটু খারাপ দেখায়। অন্যেদের গীবতের মাধ্যমে সহজেই প্রমান করা যায় যে, সকলেই দোষযুক্ত, আমি অনেক ভাল।

মানবীয় এ দুর্বলতার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

يُبْصِرُ أَحَدُكُمْ الْقَذَاةَ فِيْ عَيْنِ أَخِيْهِ، وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِيْ عَيْنِهِ

"তোমাদের মধ্যে একজন মানুষ তার ভাইয়ের চোখের সামান্য কুটাটুকু দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চোখের মধ্যে বিশাল বৃক্ষের কথা ভুলে যায়।" (সহীহ ইবন হিব্বান, মাওয়ারিদুয্ যামআন ৬/৯০। সহীহ।)

গীবতের নিন্দায় এবং এর কঠোরতম শাস্তির বর্ণনায় অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। এখানে আমরা দা'ওয়াত কেন্দ্রিক ঘৃণ্য গীবত ও গীবতের কারণগুলি বুঝতে চাই। আমাদের সমাজে দা'ওয়াতে লিপ্ত সম্মানিত মুমিনগণকে শয়তান বিভিন্নভাবে গীবতে লিপ্ত করে। তন্মধ্যে প্রধান পথ দুইটি: ১. পাপে বা অন্যায়ে লিপ্ত ব্যক্তিগণের গীবত ও ২. দা'ওয়াতে লিপ্ত অন্য মুসলিমের গীবত।

৪. ৬. ১. পাপীর গীবত

দা'ওয়াতে লিপ্ত মুমিন স্বভাবতই পাপে লিপ্ত মানুষদেরকে অপছন্দ করেন। এদের মধ্যে অনেকেই ক্ষমতাধর বা তাদের সামনে কিছু বলার সুযোগ তিনি পান না। এজন্য এদের অনুপস্থিতিতে সুযোগ পেলেই এদের বিভিন্ন দোষ

বা অপরাধ আলোচনা করেন। তিনি মনে করেন, এভাবে তিনি পাপের প্রতি তাঁর ঘৃণা প্রকাশ করছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি গীবত ও অপবাদের মাধ্যমে হারামে লিপ্ত হচ্ছেন এবং নিজের আমল ধ্বংস করছেন। "অমুক কর্ম পাপ এবং আমি তা ঘৃণা করি। যারা এতে লিপ্ত সবাই ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত", একথা বললে পাপের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ হতে পারে। কিন্তু "অমুক ব্যক্তি অমুক পাপে লিপ্ত", একথা তার অনুপস্থিতিতে বললে সন্দেহাতীতভাবে গীবত হবে।

এই হারামকে হালাল করার জন্য একটি বানোয়াট হাদীস বলা হয় :

لَيْسَ لِفَاسِقٍ غِيْبَةٌ

"পাপীর গীবত নেই।" অর্থাৎ পাপীর দোষ পিছনে আলোচনা করলে গীবত হয় না। হাদীসটি বানোয়াট বা অত্যন্ত দুর্বল। (মুখতাসারুল মাকাসিদ, ১৬৪ পৃ, যয়ীফুল জামি, ৭০৯পৃ)। এখানে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

প্রথমত, পাপীর গীবত না হলে দুনিয়াতে গীবত বলে কিছু থাকে না। আমরা সকলেই পাপী। কিছু না কিছু পাপে আমরা সকলেই জড়িত। আর গীবত তো সত্য দোষ বলা। এজন্য নিষ্পাপ মানুষের তো গীবত হবে না, অপবাদ হবে। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য নির্দেশনা থেকে আমরা নিশ্চিত জানি যে, যে কোনো পাপীর যে কোনো প্রকারের দোষত্রুটি, যা তার অনুপস্থিতিতে আলোচিত হয়েছে জানলে তার খারাপ লাগে, তা তার অনুপস্থিতিতে আলোচনা করাই গীবত।

দ্বিতীয়ত, কোনো ব্যক্তির দোষত্রুটির কথা তার অনুপস্থিতিতে বলার একটিই শরীয়ত-সম্মত কারণ আছে, তা হলো, অন্য কাউকে অধিকতর ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। এক্ষেত্রেও মুমিনকে বুঝতে হবে যে, এ কাজটি একটি ঘৃণিত কাজ। একান্তই বাধ্য হয়ে তিনি তা করছেন। কাজেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই না বলা।

তৃতীয়ত, গীবত কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে হারাম করা হয়েছে। কুরআন-হাদীসে স্পষ্টভাবে গীবতকে কোনো অবস্থাতেই হালাল বলা হয় নি। শুধু কোনো মানুষ বা জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করার একান্ত প্রয়োজনে তা বৈধ হতে পারে বলে আলেমগণ মত প্রকাশ করেছেন। এখন মুমিনের কাজ হলো কুরআন ও হাদীস যা নিষেধ করেছে তা ঘৃণাভরে পরিহার করা। এমনকি সে কর্মটি কখনো জায়েয হলেও তিনি তা সর্বদা পরিহার করার চেষ্টা করবেন। শুকরের মাংস, মদ, রক্ত ইত্যাদি আল্লাহ হারাম করেছেন এবং প্রয়োজনে জায়েয বলে ঘোষণা করেছেন। এখন মুমিনের দয়িত্ব কী? বিভিন্ন অজুহাতে প্রয়োজন দেখিয়ে এগুলি ভক্ষণ করা? না যত কষ্ট বা প্রয়োজনই হোক তা পরিহার করার চেষ্টা করা?

গীবতও ঠিক অনুরূপ একটি হারাম কর্ম যা একান্ত প্রয়োজনে বৈধ হতে পারে। গীবত ও শুকরের মাংসের মধ্যে দুইটি পার্থক্য। **প্রথম পার্থক্য** হলো

শুকরের মাংস যে প্রয়োজনে খাওয়া যেতে পারে তা কুরআনেই বলা হয়েছে, পক্ষান্তরে গীবতের ক্ষেত্রে অনুরূপ কিছু কুরআন বা সহীহ হাদীসে বলা হয়নি। **দ্বিতীয় পার্থক্য** হলো, সাধারণভাবে শুকরের মাংস ভক্ষণ করা শুধুমাত্র আল্লাহর হক্ক জনিত পাপ। সহজেই তাওবার মাধ্যমে তা ক্ষমা হতে পারে। পক্ষান্তরে গীবত বান্দার হক্ক জনিত পাপ। এর ক্ষমার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমা প্রয়োজন। এজন্য মুমিনের দায়িত্ব হলো বিভিন্ন অজুহাতে বা যয়ীফ-মাউযূ হাদীসের বরাত দিয়ে এ পাপে লিপ্ত না হয়ে যথাসাধ্য একে বর্জন করা।

চতুর্থত, আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর দায়িত্ব হলো যথাসাধ্য পরিবর্তন ও সংশোধন। গীবতের মাধ্যমে কখনোই কোনো পাপের পরিবর্তন বা সংশোধন হয়নি বা হয় না। এতে শুধুমাত্র নিজের পাপ বৃদ্ধি পায়।

৪. ৬. ২. 'দা'য়ী'র গীবত

'দায়ী'গণ কখনো কখনো একে অন্যের গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়েন। দ্বীনের দা'ওয়াতে রত মুসলিমগণ এখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত। দীন পালনের মাধ্যম হিসাবেই আমরা দল করি। এ সকল দলের মধ্যে বিভিন্ন মতপার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যের অনেক বিষয় পদ্ধতিগত ও ইজতিহাদ কেন্দ্রিক। কিছু বিষয় কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতেই অন্যায় ও আপত্তিকর। প্রথম ক্ষেত্রে মতভেদ মেনে নেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভুলগুলি সংশোধনের জন্য উপরে বর্ণিত দা'ওয়াতের নিয়মাবলি অনুসারে তাদেরকে আদেশ, নিষেধ ও দা'ওয়াত করতে হবে।

কিন্তু, দুঃখজনক হলো যে, এগুলির পরিবর্তে আমরা একদলের কয়েকজন একত্রিত হলে বা কোনো সুযোগ পেলে অন্য দলের বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত বা মতামতগত ভুলত্রুটি আলোচনা করে গীবতে রত থাকি। এতে কোনো মানুষ সংশোধিত হয় না বা দ্বীনের কোনো উপকার হয় না। এ জাতীয় গীবত থেকে আমরা কয়েকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হই,

প্রথমত, কঠিন হারাম কর্ম করে নিজের আখেরাত নষ্ট করি।

দ্বিতীয়ত, গীবতে ব্যস্ত থাকার ফলে আল্লাহর যিক্‌র ও নিজের ভুলত্রুটি স্মরণ করে তাওবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হই।

তৃতীয়ত, অন্যের ভুলত্রুটি আলোচনা করার মাধ্যমে নিজেদের মনে আত্মতৃপ্তি ও অহঙ্কার আসে, যা মুমিনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

চতুর্থত, বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিয়ামতের দিন গীবতকারীর সাওয়াব গীবতকৃত ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে এবং গীবতকৃতর পাপ গীবতকারীর ঘাড়ে চাপানো হবে। এতে আমরা বুঝতে পারি যে, বিভিন্ন পাপ বা ভুলত্রুটির কারণে যে সকল মানুষদের আমরা অপছন্দ করি, প্রকৃতপক্ষে আমাদের কষ্টার্জিত সাওয়াব তাদেরকে দান করছি এবং তাদের পাপগুলি আমরা গ্রহণ করছি।

৪. ৬. ৩. সংশোধন বনাম দোষ গোপন

অন্যের দোষ তার অনুপস্থিতিতে বলতে যেমন নিষেধ করা হয়েছে, অপরদিকে তা গোপন করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"মুসলিম মুসলিমের ভাই; একজন আরেকজনকে জুলুম করে না এবং বিপদে পরিত্যাগ করে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাতে ব্যস্ত থাকবে আল্লাহ তার প্রয়োজন মেটাতে থাকবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের কষ্ট-বিপদ দূর করবে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন করবে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।" (বুখারী ও মুসলিম।)

মিশরের গভর্নর সাহাবী উকবা ইবনু আমির (রা) এর সেক্রেটারী 'আবুল হাইসাম দুখাইন' বলেন, আমি উকবা (রা)-কে বললাম, আমাদের কয়েকজন প্রতিবেশী মদপান করছে। আমি এখনি যেয়ে পুলিশ ডাকছি যেন তাদের ধরে নিয়ে যায়। উকবা বলেন, তুমি তা করো না। বরং তুমি তাদেরকে উপদেশ দাও এবং ভয় দেখাও।.... আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে বলতে শুনেছি,

مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُؤْمِنٍ فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا مَوْءُودَةً فِي قَبْرِهَا

"যে ব্যক্তি কোনো মুমিন ব্যক্তির দোষ গোপন করল, সে যেন জীবন্ত প্রেথিত একটি কন্যাকে তার কবর থেকে উঠিয়ে জীবন দান করল।" (সহীহ ইবনু হিব্বান।)

উপরের হাদীসগুলির আলোকে আমরা বুঝতে পারছি যে, মুমিন আল্লাহর পথে আহ্বান করবেন। কোনো অন্যায় দেখলে তা সংশোধনের চেষ্টা করবেন। কিন্তু কখনোই মুমিন অন্যের গোপন দোষ অনুসন্ধান করবেন না। কারো কোনো দোষ জানতে পারলে তা গোপন রাখবেন। সাধ্যমত গোপনেই তাকে সংশোধনের চেষ্টা করবেন। তিনি কারো গোপন দোষ অন্যের সামনে প্রকাশ করবেন না। সংশোধনের প্রয়োজনে একান্ত বাধ্য হলে শুধুমাত্র যাকে বললে সংশোধন হবে তাকেই বলবেন। কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ তিনি আলোচনা করবেন না। মুমিনের দায়িত্ব হলো মানুষকে ভালপথে আনতে চেষ্টা করা। অহেতুক অন্যের দোষ আলোচনা করে আত্মতৃপ্তি লাভ ও পাপ অর্জন মুমিনের দায়িত্ব নয়। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
সুন্নাতের আলোকে দা'ওয়াত

৫. ১. ইবাদত পালনে সুন্নাতের গুরুত্ব

৫. ১. ১. সুন্নাতের অর্থ ও পরিচয়

সুন্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলোঃ মুখ, ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন-পদ্ধতি, কর্মধারা ইত্যাদি। সাধারণভাবে 'সুন্নাত' বলতে আমরা বুঝি ফরয ও ওয়াজিবের পরবর্তী পর্যায়ের নেককর্ম যা করা অত্যাবশ্যকীয় নয়, তবে উচিত, উত্তম ও প্রয়োজনীয়। তবে হাদীসে শরীফে এবং সাহাবী তাবেয়ীগণের পরিভাষায় সুন্নাত বলতে বুঝানো হয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সকল প্রকারের নির্দেশ, কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ। এছাড়া তাঁর সাহাবীদের কর্ম ও আদর্শও এই অর্থে 'সুন্নাত' বলে অভিহিত হয়।

সুন্নাতের অর্থ ও পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে। এ পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামগ্রিক জীবন-পদ্ধতিই সুন্নাত। যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে করেছেন তা সেভাবে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি করেন নি, অর্থাৎ বর্জন করেছেন তা না করা বা বর্জন করাই সুন্নাত। কোন কর্ম পালন বা বর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব, পদ্ধতি, ক্ষেত্র, সময়, স্থান ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে সুন্নাতের বেশি বা কম হলে বা সুন্নাতের বাইরে গেলে তা 'খেলাফে সুন্নাত' হবে। তিনি যা করেন নি বা "খেলাফে সুন্নাত" কর্ম কখনোই দ্বীনের অংশ বা ইবাদতের অংশ হতে পারে না। তবে জাগতিক কর্ম হিসাবে বা ইবাদতের উপকরণ হিসাবে শরীয়তের বিধানের আলোকে তা জায়েয বা নাজায়েয হতে পারে।

৫. ১. ২. সুন্নাতের বাইরে কোনো ইবাদত কবুল হবে না

কুরআন-হাদীসের অগণিত নির্দেশনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহর দরবারে যে কোনো ইবাদত কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো যে, সেই ইবাদতটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর সুন্নাত বা রীতি অনুসারে পালিত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে কেবলমাত্র ইবাদতের নির্দেশই দেন নি, উপরন্তু প্রতিটি ইবাদত নিজে পালন করে ইবাদতটি পালনের বিশুদ্ধ পদ্ধতিও তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। প্রতিটি ইবাদত তাঁর পদ্ধতি বা "সুন্নাত" অনুসারে আদায় করা অত্যাবশ্যকীয়। সুন্নাতের ব্যতিক্রম কোনো কর্ম বা পদ্ধতি আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো ইবাদত যদি তাঁর পদ্ধতির বাইরে কোনোভাবে পালিত হয় তাহলে তা আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"আমাদের কর্ম যা নয় এমন কোনো কর্ম যদি কোনো মানুষ করে তাহলে তার কর্ম প্রত্যাখ্যাত হবে (কবুল হবে না)।" (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য হাদীসে তিনি বলেন,

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে অন্যমনস্ক হলো বা আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করলো তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই।" (বুখারী ও মুসলিম)

৫. ১. ৩. দা'ওয়াতের কাজও সুন্নাত পদ্ধতিতে হতে হবে

তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে, দা'ওয়াত, তাবলীগ বা দীন প্রতিষ্ঠার ইবাদত পালন করতে আমাদেরকে হুবহু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণ করতে হবে। দা'ওয়াত, বা দীন প্রতিষ্ঠার ইবাদতও যদি তাঁর সুন্নাত বা পদ্ধতির বাইরে পালিত হয় তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে এবং কবুল হবে না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাহলে কি আমাদেরকে সে যুগের মত উটের পিঠে চড়ে দা'ওয়াতের জন্য চলাচল করতে হবে? আমরা কি মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন ইত্যাদিতে দা'ওয়াতের জন্য চলাচল করতে পারব না? আমরা কি শুধু মুখে বা হাতে লিখেই দা'ওয়াতের কাজ করব? আমরা কি আধুনিক মুদ্রন, মাইক, রেডিও ইত্যাদি ইলেকট্রিক বা ইলেকট্রনিক উপকরণাদি ব্যবহার করতে পারব না? তিনি দা'ওয়াতের জন্য কোনো কারিকুলাম, সিলেবাস, সুনির্দিষ্ট বইপুস্তক, কর্মসূচী, সময়, দিন, মাস, বৎসর, স্থান বা অন্য কোনো বিষয় নির্ধারণ করে দেন নি। তাহলে কি আমরা দিন, সময় বা স্থান নির্ধারণ করে বা বইপুস্তক ইত্যাদি নির্ধারণ করে দা'ওয়াতের জন্য কোনো কারিকুলাম বা কর্মসূচী গ্রহণ করব না?

৫. ১. ৪. ইবাদত ও উপকরণের পার্থক্য

বিষয়গুলি বুঝার জন্য আমাদেরকে ইবাদত ও ইবাদতের উপকরণের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। আমি 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে এ বিষয়ে যথাসাধ্য বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করেছি। দা'ওয়াতের রত মুমিনকে আমি সবিনয়ে অনুরোধ করব বইটি পড়ার জন্য। এখানে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, **রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা করেন নি বা নির্ধারণ করেন নি তা কখনোই দ্বীনের অংশ, ইবাদতের অংশ বা সাওয়াবের উৎস নয়। তবে তা ইবাদত পালনের উপকরণ হতে পারে।**

ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে তিনি যে সকল উপকরণ বা পদ্ধতি ব্যবহার করেন নি তা দু প্রকারের। প্রথম প্রকারের উপকরণ তাঁর যুগে বিদ্যমান ছিল বা সে যুগে তার জন্য সেগুলি ব্যবহার করা সম্ভব ছিল, কিন্ত তিনি তা ব্যবহার করেন নি। এগুলি মুমিন ব্যবহার করেন না; কারণ তিনি ইচ্ছাপূর্বক তা বর্জন করেছেন। অন্য প্রকারের উপকরণ যেগুলি তাঁর যুগে ছিল না, পরবর্তীযুগে উদ্ভাবিত হয়েছে।

ইসলামের অন্যান্য বিধিবিধানের আলোকে মুমিন ইবাদত পালনের উপকরণ হিসাবে প্রয়োজনে এ ধরনের উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু কখনই এর ব্যবহারকে ইবাদত বা ইবাদতের অংশ বলে মনে করতে পারেন না। সাওয়াব নির্ভর করবে মূল ইবাদত পালনের বিশুদ্ধতা, ব্যাপকতা ও গভীরতার উপরে। এ সকল উপকরণের সাথে সাওয়াবের সামান্যতম সম্পর্ক থাকবে না।

দা'ওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পদ্ধতি ও উপকরণের সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাত এবং এ বিষয়ক কিছু ভুলভ্রান্তি এখানে আলোচনা করতে চাই।

৫. ২. দা'ওয়াতের 'মাসনূন' পদ্ধতি ও উপকরণ

আদেশ, নিষেধ, দীন প্রতিষ্ঠা বা দা'ওয়াতের যে সকল উপকরণ ও পদ্ধতি কুরআন-হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ব্যবহার করেছেন সে সকল 'মাসনূন' বা সুন্নাত সম্মত উপকরণের অন্যতম হলো ১. কুরআন, ২. হাদীস, ৩. হিকমাহ বা প্রজ্ঞা, ৪. সুন্দর ওয়ায-উপদেশ, ৫. উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা-বিতর্ক, ৬. জিহাদ ও কিতাল, ৭. অনুকরণীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা, ৮. উৎসাহ, পুরস্কার ও শাস্তি।

৫. ২. ১. কুরআন মাজীদ

কুরআন কারীম ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর দা'ওয়াতের প্রধান ও মূল উপকরণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুর্আন কারীমে তাঁকে কুরআন পাঠ করে দা'ওয়াত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। কাফিরগণকে দ্বীনের দা'ওয়াত দিতে এবং মুমিনগণকে দ্বীনের দা'ওয়াত দিতে উভয় ক্ষেত্রে তিনি নিজে সদা সর্বদা কুরআন পাঠ করে দা'ওয়াত প্রদানকেই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন।

৫. ২. ২. হিকমাহ ও হাদীস

কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর মহান রাসূল (ﷺ)-কে কুরআনের পাশাপাশি 'হিকমাত' বা প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং তিনি তাঁর উম্মাতকে কুরআনের পাশাপাশি প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন এবং কুরআনের পাশাপাশি প্রজ্ঞার মাধ্যমে তিনি দা'ওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠা করেন। (বাকারা ১২৯, ১৫১, ২৩১, ২৫১; আল-ইমরান ১৬৪; নিসা ১১৩; আহযাব ৩৪; জুমু'আহ ২)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রদত্ত 'হিকমাত' বা প্রজ্ঞা বা তাঁর আজীবনের শিক্ষা হাদীস হিসেবে সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়েছে।

৫. ২. ৩. সুন্দর ওয়ায

সুন্দর ওয়ায ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর দা'ওয়াতের অন্যতম উপকরণ। কুরআনে তাঁকে ওয়াযের মাধ্যমে দা'ওয়াত দেওয়ার জন্য বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (সূরা নিসা ৪; সূরা নাহ্ল ১২৫)। কুরআনকেও বারংবার ওয়ায হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। (সূরা বাকারা ২৭৫; সূরা ইউনূস ৫৭)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর 'ওয়ায' এর ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, তাঁর ওয়ায ছিল

মূলত কুরআন নির্ভর। বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি বক্তৃতা, ওয়ায, খুতবা ইত্যাদি সব কিছুতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুরআন পাঠ করতেন। এগুলি পাশাপাশি কিছু হিকমাহ বা উপদেশ তিনি প্রদান করতেন যা হাদীসরূপে সংকলিত। তাঁর ওয়াযের ক্ষেত্রে স্পষ্টতা, আন্তরিকতা, কৃত্রিমতাহীনতা, সরলতা, সংক্ষেপন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

৫. ২. ৪. উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা-বিতর্ক

উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা-বিতর্ক উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কুরআন অনন্য গ্রন্থ। ইহূদী, খৃস্টান, পৌত্তলিক বিভিন্ন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, কর্ম, আচার ইত্যাদির অসারতা, ভিত্তিহীনতা এবং ইসলামী বিশ্বাস ও কর্মের যৌক্তিকতা, প্রয়োজনীয়তা ও কল্যাণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, সরল ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূলনীতিই হলো প্রতিপক্ষের পদ্ধতির চেয়ে 'দা'য়ী'র পদ্ধতি উৎকৃষ্টতর হতে হবে। ভাষা, ভাব, বিনম্রতা, বন্ধুভাবাপন্নতা, আন্তরিকতা, উপস্থাপনা সকল দিক থেকেই তা হবে উৎকৃষ্টতর। প্রতিপক্ষের সম্মান প্রদান, তার ভাল গুণাবলীর প্রশংসা, ব্যক্তিগত আক্রমন বর্জন, ঢালাও অভিযোগ বর্জন ইত্যাদি কুরআনী বিতর্ক আলোচনার বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আজীবন এই পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন।

৫. ২. ৫. জিহাদ ও কিতাল

দা'ওয়াতের একটি কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত পদ্ধতি ও উপকরণ হলো জিহাদ ও কিতাল। জিহাদ অর্থ শ্রম, কষ্ট, চেষ্টা ইত্যাদি। কিতাল অর্থ যুদ্ধ। তবে ইসলামী পরিভাষায় সাধারণভাবে জিহাদ বলতে কিতাল বা যুদ্ধ বুঝানো হয়। এছাড়া দা'ওয়াতের কর্মকেও জিহাদ ও সর্বোত্তম জিহাদ বলা হয়েছে।

কুরআন-হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিতাল বা যুদ্ধ রাষ্ট্রীয় ফরয। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যম ছিল দা'ওয়াত। জিহাদ-কিতাল রাষ্ট্রের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার মাধ্যম। দা'ওয়াতের মাধ্যমে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে আল্লাহ যুদ্ধ পর্যায়ের জিহাদ বৈধ করেন নি। কুরআন ও হাদীসে জিহাদ বৈধ হওয়ার যে সকল শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির অন্যতম হলো: (১) রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া, (৩) রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ, (৪) কেবলমাত্র সশস্ত্র যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করা। "ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ" বইয়ে আমি এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলি আলোচনা করেছি।

৫. ২. ৬. নিজ আচরণের মাধ্যমে উত্তম আদর্শ স্থাপন

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর দা'ওয়াতের অন্যতম উপকরণ ছিল নিজের জীবনে আদর্শের সর্বোত্তম বাস্তবায়নের মাধ্যমে 'উসওয়া হাসানা' বা অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করা। ইবাদত, বন্দেগী, আল্লাহ-ভীতি, মানবকল্যাণ, সৃষ্টির সেবা, সততা, বিশ্বস্ততা, সাহসিকতা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সর্বোত্তম

আদর্শ। দা'ওয়াতের সফলতার এ হলো প্রধান উপায়।

৫. ২. ৭. উৎসাহ, পুরস্কার ও শাস্তি

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর দা'ওয়াতের অন্য প্রধান দিক ছিল উৎসাহ, পুরস্কার ও শাস্তি। তিনি প্রশংশনীয় কর্মে লিপ্ত মানুষদেরকে সুন্দর উপাধি, প্রশংসা, সম্মান, পুরস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে উৎসাহিত করেছেন। অপরদিকে অন্যায়ে লিপ্ত মানুষদের শাস্তিপ্রদান, কর্মের নিন্দা ইত্যাদির মাধ্যমে নিরুৎসাহিত করেছেন। সমাজে সৎ ও কল্যাণমুখি মানুষেরা যদি তাদের মূল্যায়ন না পান বা সততার কারণে তাঁরা বঞ্চিত ও অবহেলিত হন এবং অসৎ মানুষেরা গলাবাজি বা অসততারা মাধ্যমে পুরস্কৃত হন তাহলে আমাদের মুখের কথা সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। মুখের আদেশ নিষেধ ও দা'ওয়াতের ন্যায় এ ধরনের প্রশংসা, সম্মান বা উৎসাহও দা'ওয়াতের অন্যতম মাসনূন পদ্ধতি। প্রত্যেককেহৈ নিজের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অনুসারে এ দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

দা'ওয়াতের জন্য এগুলি অন্যতম মাসনূন বা সুন্নাত সম্মত উপকরণ। দা'ওয়াত-রত মুমিনের দায়িত্ব হলো যথাসম্ভব মাসনূন উপকরণের সুন্নাত সম্মত ব্যবহারের মাধ্যমে দা'ওয়াতের ইবাদত পালন করা।

৫. ৩. মাসনূন উপকরণের নিষিদ্ধ ব্যবহার

উল্লেখ্য যে, দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে উপরের মাসনূন উপকরণগুলি অনেক সময় ইসলাম-নিষিদ্ধ পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়। আবেগ বা অজ্ঞতার ফলে 'দা'য়ী' হয়ত ভাবেন যে, তিনি ইবাদত করছেন বা সাওয়াবের কাজ করছেন। অথচ তিনি মূলত পাপে লিপ্ত রয়েছেন।

৫. ৩. ১. ওহী-বহির্ভুত কথাকে ওহীর নামে চালানো

আমরা দেখেছি যে, ইসলামী দা'ওয়াত মূলত ওহী নির্ভর। আর এক্ষেত্রে ভয়ঙ্করতম অন্যায় হলো ওহীর নামে, অর্থাৎ আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের (ﷺ) নামে মিথ্যা বলা। মিথ্যা সর্বাবস্থাতেই কঠিন পাপ। আর ওহীর নামে মিথ্যা ভয়ঙ্করতম পাপ। দা'ওয়াতে রত মুমিন বিভিন্নভাবে এ কঠিন পাপে লিপ্ত হতে পারেন:

৫. ৩. ১. ১. ওহীর নামে মিথ্যা বলা

মানবীয় কথাকে ওহীর নামে চালানোর প্রধান পদ্ধতি হলো আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ﷺ) যা বলেন নি তা তাদের নামে বলা বা তাঁদের নামে কথিত মিথ্যা বা সন্দেহজনক কথা প্রচার করা।

দা'ওয়াত যেহেতু ওহী নির্ভর সেহেতু দা'ওয়াতরত ব্যক্তি চান যে, তার দা'ওয়াতের পক্ষে ওহীর বাণী শুনাবেন। ওহীর কোনো বাণী না পেলে কেউকেউ শয়তানের প্ররোচনায় মনগড়া বানোয়াট কথাকে আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ﷺ) এর কথা বলে প্রচার করেন। ইসলামের প্রথম যুগ থেকে মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীসের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে,

মানুষদেরকে ভাল পথে ডাকা ও খারাপ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ জাল হাদীস তৈরী ও প্রচার করা হয়েছে। বিভিন্ন নেক কাজের ফযীলতে ও বিভিন্ন পাপের শাস্তির বর্ণনায় অগণিত বানোয়াট কথা জালিয়াতি করে হাদীস বলে চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে, মুহাদ্দিসগণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে যে সকল জালিয়াতি উদ্ঘাটন ও চিহ্নিত করেছেন।

শয়তান এ সকল জালিয়াতকে বুঝিয়েছে যে, ভাল পথে ডাকার জন্য কুরআন ও সহীহ হাদীস যথেষ্ট নয়। কাজেই ভাল উদ্দেশ্যে তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলতে পার। বর্তমান যুগেও দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মিথ্যা, অনির্ভরযোগ্য ও দুর্বল হাদীসের ছড়াছাড়ি অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষণীয়। কোন্ হাদীসে কত বেশি ফযীলত, সাওয়াব বা শাস্তির কথা বলা আছে, অথবা কোন্ হাদীসে কত আকর্ষণীয় গল্প আছে সেটাই শুধু লক্ষ্য করেন অনেক দা'য়ী। । কোন্ হাদীসের সনদ কতটুকু শক্তিশালী তা বিবেচনা করতে তাঁরা আগ্রহী নন। এঁরা হয়ত ভাবেন, শুধু কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস দিয়ে বোধহয় মানুষকে আকৃষ্ট করা সম্ভব নয়! আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

যুগে যুগে এ প্রবণতা পূর্ববর্তী উম্মাতদেরকে ধ্বংস করেছে। কুরআন ও হাদীসে অত্যন্ত কঠিনভাবে এ প্রবণতাকে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

"আল্লাহর নামে বা আল্লাহর সম্পর্কে যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে?" (আন'আম: ২১, ৯৩, ১৪৪; আ'রাফ: ৩৭; ইউনূস: ১৭; হূদ: ১৮; আল- কাহফ: ১৫; আনকাবূত: ৬৮; সাফ্ফ: ৭।)

কুরআন কারীমে একাধিক স্থানে না-জেনে, আন্দাজে বা অনুমান নির্ভর করে আল্লাহ, আল্লাহর দীন, বিধান ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। সূরা আ'রাফ-এর ৩৩ আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ

"বল,. 'আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর শরীক করা- যার কোনো সনদ তিনি প্রেরণ করেন নি, এবং আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই।"

সূরা বাকারার ১৬৮-১৬৯ আয়াতেও অনুরূপ এরশাদ করা হয়েছে।

আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

لا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ [يَكْذِبْ] عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ.

"তোমরা আমার নামে মিথ্যা বলবে না; কারণ যে ব্যক্তি আমার নামে

মিথ্যা বলবে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

সালামাহ ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"আমি যা বলিনি তা যে আমার নামে বলবে তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম।" (বুখারী)

'আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ'-সহ প্রায় ১০০ জন সাহাবী এ অর্থে বিভিন্ন হাদীস রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন, সকল হাদীসের অর্থ একই, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা বলেন নি তা তার নামে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় বা আন্দাজ-অনুমান করে বলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং এর শাস্তি জাহান্নাম।

কোনো হাদীসের নির্ভুলতার বিষয়ে সন্দেহ হলে তা হাদীস হিসাবে গ্রহণ করা বা প্রচার করাও নিষিদ্ধ। যদি কেউ যাচাই না করে যা শুনে তাই হাদীস বলে গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে তাহলে হাদীস যাচাইয়ে তার অবহেলার জন্য সে হাদীসের নামে মিথ্যা বলার পাপে পাপী হবে। উপরন্তু, যদি কোনো হাদীসের নিভুলতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি সে হাদীস বর্ণনা করে তাহলে সেও মিথ্য হাদীস বলার পাপে পাপী হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

"একজন মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বর্ণনা করবে।" (মুসলিম) অন্য হাদীসে তিনি বলেন,

مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ حَدِيْثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ.

"যে ব্যক্তি আমার নামে কোনো হাদীস বলবে এবং তার মনে সন্দেহ হবে যে, হাদীসটি মিথ্যা হতে পারে, সেও একজন মিথ্যাবাদী।" (মুসলিম)

দা'ওয়াতে রত মুমিনগণকে এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। আমি যদি আজীবন একটিও হাদীস না বলি বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) -এর নামে কিছুই না বলি তাহলে হয়ত আমার কোনো গোনাহ হবে না। কিন্তু আমি দা'ওয়াতের কাজ করতে যেয়ে যদি কোনো মিথ্যা বা সন্দেহজনক হাদীস রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নামে বলে ফেলি তাহলে হয়ত আমাকে মিথ্যাবাদীরূপে কিয়ামতের দিন উঠতে হতে পারে। এর চেয়ে লাঞ্ছনা আর কী হতে পারে!

অনেক 'দা'য়ী' যা শুনেন বা পড়েন তাই হাদীস রূপে বলেন। আমরা দেখলাম যে, হাদীসের নামে মিথ্যাচাররের জন্য এটাই যথেষ্ঠ। কোনো হাদীস গ্রন্থে হাদীস পড়লেও তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তা বলা উচিত নয়। বড়জোর বলা যায় যে, অমুক গ্রন্থে হাদীটি আছে, এর সনদের বিষয় আমি ভাল জানি না। 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন' বা 'হাদীসে আছে' এ কথাটি মুখে উচ্চারণের পূর্বে মুমিনের উচিত শতবার চিন্তা করা।

অধিকাংশ হাদীস-গ্রন্থের সংকলকগণের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে কথিত বা প্রচারিত শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সকল হাদীস সনদ সহকারে সংকলন করা, যেন মানুষেরা সনদের আলোকে তা বিচার করে গ্রহণ করতে পারে। কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস ঢালাও সংকলন না করে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন করার চেষ্টা করেন। বুখারী ও মুসলিমের সকল হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ সংকলিত অধিকাংশ হাদীস সহীহ বা হাসান। তবে এগুলিতে অনেক দুর্বল হাদীসও রয়েছে, যেগুলির দুর্বলতার কথা সংকলকগণ নিজেরাই উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য হাদীসগ্রন্থগুলিতে সহীহ, যয়ীফ, মাউযূ সকল প্রকারের হাদীস সংকলিত করা হয়েছে।

আমরা অনেক সময় ভাবি যে, অমুক বুজুর্গ হাদীসটি লিখেছেন, তিনি কি বিচার না করেই লিখেছেন?! এ চিন্তা ঠিক নয়। কোনো বুজুর্গ যদি তাঁর গ্রন্থে কোনো হাদীস লিখে হাদীসটি সহীহ বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন তাহলে তার রেফারেন্সে হাদীসটি বলা যেতে পারে। নইলে শুধুমাত্র কোনো গ্রন্থে আছে বলেই কোনো হাদীস বলবেন না। হাদীসটি কোন্ হাদীস গ্রন্থে সংকলিত এবং হাদীসটির সনদ সহীহ বা গ্রহণযোগ্য কিনা সে বিষয়ে মোটামুটি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো হাদীস বর্ণনা না করাই মুমিনের জন্য নিরাপদ। কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রত্যেককেই নিজ কর্মের হিসাব নিজেই দিতে হবে।

ফযীলতের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করা যায় বলে প্রচলিত একটি কথা আমাদেরকে অনেক সময় বিভ্রান্ত করে। যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করা আর যয়ীফ হাদীসকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বলে প্রচার করা এক নয়। অনেক আলেম কতগুলি শর্ত সাপেক্ষ ফযীলতের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করা জায়েয বলেছেন। শর্তগুলির মধ্যে রয়েছে:

(১). যয়ীফ হাদীসটি খুব বেশি যয়ীফ বা দুর্বল হবে না।

(২). যয়ীফ হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কথা বলে মনে নিশ্চিত মনে করা যাবে না। সাবধানতামূলকভাবে আমল করতে হবে। অর্থাৎ মনে করতে হবে, হাদীসটি নবীজী ﷺ -এর কথা হতেও পারে, কাজেই পারলে আমল করি।

অন্য অনেক আলেম যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করতে নিষেধ করেছেন। যেখানে অসংখ্য সহীহ হাদীসে নির্দেশিত কর্ম করার সময়ই অধিকাংশ মুসলিম পান না, সেখানে এসকল যয়ীফ হাদীস বিবেচনা করা ঠিক নয়। এ ছাড়া তাঁরা বলেন যে, যারা যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করা জায়েয বলেছেন তাঁরা শর্ত করেছেন যে, বিশ্বাস বা আকীদাগত বিষয়ে কখনোই যয়ীফ হাদীসের উপর নির্ভর করা যাবে না, শুধুমাত্র কর্মের ক্ষেত্রে সাবধানতামূলক কর্ম করা যাবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো বিশ্বাস ও কর্ম বিচ্ছিন্ন করা মুশকিল। কারণ যয়ীফ হাদীসের উপর যিনি আমল করছেন তিনি অন্তত বিশ্বাস করছেন যে, এই আমলের জন্য এই ধরনের সাওয়াব পাওয়া যেতে পারে। এজন্য এঁদের মতে যয়ীফ হাদীস, যা

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা নয় বলেই বিবেচিত, তার পিছনে শ্রম ব্যয় অর্থহীন। সর্বাবস্থায়, সকল আলিম ও মুসলিম উম্মাহ একমত যে, মাওযু বা বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করা বা তার উপর আমল করা একেবারেই নিষিদ্ধ ও হারাম।

৫. ৩. ১. ২. ব্যাখ্যাকে ওহীর সাথে সংযুক্ত করা

ওহীর নামে মিথ্যা বলার আরেকটি পদ্ধতি আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ﷺ) যা বলেছেন তার তাফসীর বা ব্যাখ্যাকে ওহীর অংশ বানিয়ে দেওয়া, যাতে শ্রোতা বা পাঠকের কাছে মনে হয়, ব্যাখ্যাও বোধহয় আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের (ﷺ) কথা।

ওহী আল্লাহর বাণী। আর তাফসীর বা ব্যাখ্যা মানুষের কথা। কোনো ব্যাখ্যাই ওহী নয়। কাজেই ব্যাখ্যাকে ওহী থেকে পৃথক রাখতে হবে। এছাড়া ওহীর ব্যাখ্যা অবশ্যই সুন্নাতের আলোকে করতে হবে। নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী করলে তা অপব্যাখ্যায় পরিণত হবে। দা'ওয়াতে রত অনেক মুমিন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এ অন্যায়ের মধ্যে নিপতিত হন। কুরআন ও হাদীসের বাণীগুলির তরজমা করার সময় আমরা আমাদের পদ্ধতির আলোকে এমনভাবে অনুবাদ করি যেন বাণীটি আমাদের পদ্ধতিই সমর্থন করছে। যেমন 'জিহাদ বা কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ' বিষয়ক আয়াতগুলি আমরা আমদের পছন্দমত 'আত্মশুদ্ধির চেষ্টা', 'আন্দোলন' বা 'দা'ওয়াত' অর্থে অনুবাদ করি। আমাদের উচিত অনুবাদ ও ব্যাখ্যাকে সর্বদা পৃথক রাখা।

৫. ৩. ১. ৩. অনুবাদের ক্ষেত্রে সংযোজন বা বিয়োজন

ওহীর নামে মিথ্যা বলার তৃতীয় পদ্ধতি হলো, অনুবাদের ক্ষেত্রে শাব্দিক অনুবাদ না করে অনুবাদের সাথে নিজের মনমত কিছু সংযোগ করা বা কিছু বাদ দিয়ে অনুবাদ করা। যেমন আমরা বলি, কুরআনে আছে, "আদম যখন গন্দম ফল ভক্ষণ করলেন...." এখানে 'গন্দম ফল' কথাটি অতিরিক্ত বাড়ানো যা কুরআনে বা হাদীসে কোথাও নেই। অনুরূপভাবে আমরা বলি, কুরআনে আছে, যখন যুলাইখা ইউসূফ (আ)-কে বললেন...." (যুলাইখা) নামটি আমাদের কথা, কুরআনের কথা নয়। অনুবাদের সময় নিজের পছন্দ অনুযায়ী কিছু বাদ দেওয়াও একই পর্যায়ের অপরাধ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর বাণী সর্বাবস্থায় আক্ষরিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এরপর আমাদের ব্যাখ্যা, শিক্ষা ইত্যাদিকে পৃথকভাবে উপস্থাপিত করতে হবে।

৫. ৩. ১. ৪. দ্বীনের নামে অনুমান নির্ভর মতামত বা ফাতওয়া দেওয়া

ওহীর নামে মিথ্যা বলার চতুর্থ পদ্ধতি হলো, আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ﷺ) বলেছেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে আন্দাজ-অনুমানের উপর কিছু বলা। অধিকাংশ সময় আমরা আন্দাজেই বলি, এ ঠিক নয়, এ ইসলামে থাকতে পারে না, এ জায়েয হতে পারে না ইত্যাদি। আমরা অনেক সময় দুই একটি আয়াত বা হাদীসের উপর নির্ভর করেই বলে ফেলি, অমুক বিষয় হারাম, বা অমুক বিষয় ইসলামে নেই। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে। আমরা যতটুকু জানি ততটুকুই বলব। নইলে বলব, এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু আমি জানি না।

৫. ৩. ২. গল্প নির্ভর ওয়ায

আমরা দেখেছি যে, দা'ওয়াতের একটি মাসনূন উপকরণ হলো ওয়ায। ওয়ায অবশ্যই কুরআন ও হাদীস নির্ভর হবে। ওয়াযের নামে মিথ্যা হাদীস, বানোয়াট গল্প বা পরবর্তী যুগের বুজুর্গগণের নামে প্রচারিত অনির্ভরযোগ্য বা সনদ-বিহীন কাহিনী বলার অগণিত ক্ষতির একটি হলো কুরআন, হাদীস, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণ থেকে মুসলিম উম্মাহকে দূরে সারিয়ে দেওয়া।

৫. ৩. ৩. ঝগড়া নির্ভর বিতর্ক

দা'ওয়াতের জন্য, বিভিন্ন দা'ওয়াত কেন্দ্রিক দলের মধ্যে বা দা'ওয়াত বিরোধীদের সাথে আলোচনা বা বিতর্কের নামে ঝগড়া, বহস, বিদ্বেষমূলক বিতর্ক, হিংসা বা ঘৃণা প্রচার ইত্যাদি কঠিন হারাম কর্ম যেন না ঘটতে পারে সে দিকে দা'ওয়াত-রত মানুষদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এখানে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে।

প্রথমত: সূরা আনকাবূতের ৪৬ আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আহলু কিতাব বা ইহূদী-নাসারাদের সাথেও উত্তমভাবে ছাড়া বিতর্ক না করতে। তাহলে মুসলিমদের সাথে বিতর্কের আদব কেমন হতে পারে?

দ্বিতীয়ত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন হাদীসে বারংবার বিতর্ক পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ গ্রন্থেও আমরা এ অর্থে একাধিক হাদীস দেখেছি। যে ব্যক্তি নিজের মত সঠিক জেনেও বিতর্ক পরিত্যাগ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে বাড়ি বানিয়ে রাখবেন বলে তিনি বলেছেন। অন্যান্য হাদীসে দীন নিয়ে ঝগড়া-বিতর্ক বিভ্রান্তির কারণ বলে তিনি জানিয়েছেন।

তৃতীয়ত: বাহাস বা ঝগড়া মানুষকে সত্য গ্রহণের পথে বড় বাধা। বিতর্কের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ একটি মত গ্রহণ করে সে পক্ষে বিতর্ক করেন। বিতর্কে হেরে গেলেও তারা তা মানতে চান না; কারণ বিষয়টি অহংবোধ ও মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। মুমিনদের দায়িত্ব হলো খোলা মনের আলোচনার মাধ্যমে সঠিক বিষয় জানার চেষ্টা করা। তা সম্ভব না হলে বিতর্ক এড়িয়ে নিজের কাজ করা ও ভিন্নমতাবলম্বীদের জন্য দুআ করা আমাদের দায়িত্ব।

৫. ৩. ৪. হিকমাত-এর নামে অবৈধ কর্ম

হিকমাহ-এর নামে ইসলামে নিষিদ্ধ কোনো মাধ্যম ব্যবহার করা যায় না। কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে কোনো পাপ, অন্যায় বা নিষিদ্ধ কর্ম করা ইসলামে বৈধ নয়। মিথ্যা বলা, মদপান করা, ধোঁকা দেওয়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্মকে 'হিকামাহ' বলে দা'ওয়াতের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার বৈধ নয়।

৫. ৩. ৫. জিহাদ বা কিতালের নামে মারামারি বা হত্যা

জিহাদ-কিতালের নামে মারামারি বা হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া বা আইন ও বিচার নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে একটি মারাত্মক বিভ্রান্তি।

কুরআন-হাদীসে যেমন বিভিন্ন ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনি ইবাদতের জন্য শর্তাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। অগণিত স্থানে নামাযের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি দু-একটি স্থানে কিবলা, পবিত্রতা, সতর, সময়, নিয়্যত ইত্যাদি শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যদি এসকল শর্ত অবজ্ঞা করে ইচ্ছামত নামায পড়তে থাকেন তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

জিহাদ-কিতালের ক্ষেত্রেও তেমনি অগণিত স্থানে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি কোথাও কোথাও জিহাদের জন্য রাষ্ট্র, রাষ্ট্রপ্রধান, রাষ্ট্রীয় ঘোষণা, সন্ধি, আত্মসমর্পন বা জিযিয়ার সুযোগ প্রদান ইত্যাদি শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল শর্তের বাইরে জিহাদ করলে তা ইবাদত হবে না, বরং ইসলাম বিরোধী কর্ম বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ব্যক্তিগতভাবে বা গোষ্ঠীগতভাবে কারো বিরুদ্ধে মারামারি, খুনোখুনি, বিচার বা শাস্তি কখনোই জিহাদ নয়। এগুলি ইসলাম নিষিদ্ধ ফাসাদ, ফিতনা, সন্ত্রাস, হত্যা ও মানুষের ক্ষতি ছাড়া কিছুই নয়। কাজেই অমুক ব্যক্তি ইসলামের বিরোধিতা করেছে, দা'ওয়াতের বিরোধিতা করেছে বা ইসলাম বিরোধী কথা বলেছে কাজেই সে ইসলামের শত্রু এবং তাকে শাস্তি দিতে হবে বা তার বিরুদ্ধে জিহাদের বিধান প্রয়োগ করতে হবে এই আবেগপ্রসূত চিন্তা মুমিনকে বিভ্রান্তি ও সার্বিক ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করবে। এ বিষয়ে "ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ" গ্রন্থটি পড়তে পাঠককে অনুরোধ করছি।

৫. ৪. দা'ওয়াতের আধুনিক উপকরণ

৫. ৪. ১. মিডিয়া, মিছিল, হরতাল ইত্যাদি আধুনিক উপকরণ

দা'ওয়াতের জন্য যে সকল আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করা হয় বা করা যায় সেগুলির অন্যতম হলো কুরআন, সুন্নাহ, ওয়ায, ন্যায়ের উৎসাহ, অন্যায়ের আপত্তি ইত্যাদির জন্য পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, ওয়েবসাইট ও অন্যান্য আধুনিক উপকরণ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার এবং র‍্যালী, মিছিল, হরতাল, ধর্মঘট, মানববন্ধন, নির্বাচন ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করা।

৫. ৪. ২. আধুনিক উপকরণ ব্যবহারের শর্তাবলী

এ সকল উপকরণের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয় :

প্রথমত, এ উপকরণগুলি ইসলামের বিধিবিধানের পরিপন্থী না হলে তা প্রয়োজন ও সুযোগমত ব্যবহার করা যাবে। তবে সেগুলিকে কখনোই দ্বীনের বা ইবাদতের অংশ মনে করা যাবে না। কেউ সেগুলি ব্যবহার না করলে তাকে নিন্দা করা বা তার দা'ওয়াতের ইবাদত পালনে ত্রুটি হচ্ছে বলে মনে করার অবকাশ নেই।

দ্বিতীয়ত, প্রয়োজন অনুসারেই তা ব্যবহার করতে হবে। এ সকল উপকরণের ব্যবহারে অমুসলিম সম্প্রদায়ের অন্ধ অনুকরণ অবশ্যই বর্জনীয়।

তৃতীয়ত, এ সকল উপকরণের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ইসলামী আখলাকের পূর্ণ উপস্থিতি আবশ্যকীয়। আন্তরিকতা, ভালবাসা, বিনম্রতা, বন্ধুভাবাপন্নতা, উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয় সকল অবস্থায় পালনীয়। গীবত, ঢালাও অভিযোগ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই বর্জনীয়। অনেক সময় আমরা ওয়ায, দা'ওয়াত, তাফসীর, খুতবা ইত্যাদির সময় ইসলামী আখলাক অনুসরণ করি। পক্ষান্তরে নির্বাচন, জনসভা, মিছিল, র‍্যালী ইত্যাদির সময়ে পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণ করি। এগুলিতে আমরা কাফির-ফাসিকদের মত জ্বালাও পোড়াও, ভেঙ্গে ফেল, গুড়িয়ে দাও ইত্যাদি ভাষা ব্যবহার, চিৎকার, লাফালাফি, গালাগালি, হাতে তালি ইত্যাদি ইসলাম- নিষিদ্ধ কর্ম করে থাকি। মনে হয় এগুলিতে ইসলাম পালনের প্রয়োজন নেই বা এগুলি ইসলামী কায়দায় করা যায় না। কাফির ফাসিকদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও মুমিনের দা'ওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠা কখনোই একই আখলাকের হতে পারে না।

৫. ৪. ৩. হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, কুশপুত্তলিকা

আধুনিক উপকরণগুলি অবশ্যই ইসলামী বিধিবিধানের আওতায় ব্যবহার করতে হবে। দা'ওয়াত, আদেশ, নিষেধ বা প্রতিবাদের নামে ইসলাম নিষিদ্ধ কোনো কাজ করা যায় না। হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ এ জাতীয় একটি আধুনিক উপকরণ, যা পাশ্চাত্য জগত থেকে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং অনেক সময় পাশ্চাত্যের অনুকরণে ইসলাম বিরোধীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

যদি কোনো সমাজে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নাগরিকদের মতামত প্রকাশের জন্য মিছিল, হরতাল ইত্যাদির প্রচলন ও স্বীকৃতি থাকে তাহলে সে সমাজের 'দা'য়ী'গণ দা'ওয়াতের বা আদেশ নিষেধের জন্য হয়ত তা ব্যবহার করতে পারেন, তবে তা অবশ্যই স্বতস্ফূর্ত ও ঐচ্ছিক হলে। হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, প্রতিবাদসভা ইত্যাদির নামে রাস্তাঘাট বন্ধ করা, কাউকে কষ্ট দেওয়া, জোরপূর্বক অংশগ্রহণ করানো, জানমালের ক্ষতি করা, কর্মস্থলের অধিকার নষ্ট করা ইত্যাদি সবই কঠিন হারাম কর্ম। অনুরূপভাবে মুর্তি, কুশপুত্তলিকা বা কার্টুনমুর্তি তৈরি করা, ফাঁসি দেওয়া, পোড়ানো ইত্যাদিও ইসলাম-নিষিদ্ধ কর্ম। এগুলি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া কিছুই নয়।

পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে হরতালের সময় কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ কাজ বন্ধ করে দেন। ইসলামের নির্দেশে কর্মচারী বা কর্মকর্তা কর্মদাতার সাথে চুক্তি মোতাবেক পরিপূর্ণ সময় কর্ম করতে বাধ্য। তিনি তাঁর চুক্তি বাতিল করতে পারেন, কিন্তু চুক্তিবদ্ধ থাকা অবস্থায় চুক্তি ভঙ্গ করতে পারেন না। তাহলে জুলুম ও মানুষের হক্ক নষ্ট করার পাপে পতিত হবেন। তিনি তাঁর কর্মদাতার অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারেন। কিন্তু পাপের মাধ্যমে নয়। কর্মদাতার অন্যায়ের ক্ষেত্রেও তিনি কর্ম না করে টাকা নিতে পারেন না। আইনানুগ পদ্ধতিতে অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারেন।

তাহলে যেক্ষেত্রে কর্মদাতার কোনো অন্যায় নেই, রাষ্ট্রের বা অন্য কারো অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনি চুক্তির খেলাফ করে কাজ না করে বসে থাকবেন কী-ভাবে!

এছাড়া এ জাতীয় কর্ম অনেক সময় উম্মাতের জন্য ক্ষতিকর। আমেরিকা বা ইসরাইলের কোনো একটি অন্যায়ের প্রতিবাদে বাংলাদেশের মানুষ একদিন হরতাল-ধর্মঘট পালন করলে ইহূদীদের কোনো ক্ষতি হবে না। ক্ষতি হবে বাংলাদেশের জনগন ও রাষ্ট্রের। এরূপ কর্ম কখনোই শরীয়তে বৈধ হতে পারে না এবং কোনো অবস্থাতেই ন্যায় প্রতিষ্ঠার বা অন্যায়ের প্রতিবাদের ইসলামী মাধ্যম হতে পারে না। বিশ্বের যে কোনো স্থানে মাজলুম মানুষ ও প্রাণীর প্রতি সমবেদনা ও জুলুমেরর নিন্দা করা মুমিনের দায়িত্ব। তবে তা ইসলামী আখলাক ও পদ্ধতির আওতায় করতে হবে। গণমাধ্যমের ব্যবহার, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, জালিমের কাছে প্রতিবাদ পাঠানো, মাজলুমের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি অনেক পদ্ধতি রয়েছে যা ইসলাম সম্মত।

পাশ্চাত্য স্টাইলে জাগতিক ক্ষমতার দ্বন্ধে লিপ্ত মানুষেরা স্বভাবতই হালাল হারামের তোয়াক্কা করবেন না। কিন্তু দা'ওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠার কর্মে লিপ্ত মুমিনকে অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশ, বান্দার হক্ক ইত্যাদির বিষয় গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের প্রতিটি কাজের জন্য একদিন আল্লাহর দরবারে চুলচেরা হিসাব দিতে হবে। এ দুনিয়ার সামাজিক জীবনে এ সকল হক্ক নষ্ট করা হয়ত আমরা খুবই হালকাভাবে দেখি, কারণ, কোনো অন্যায় সর্বত্র ঘটতে দেখলে তা গা-সওয়া হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর হিসাবে আমরা পার হতে পারব কি?

৫. ৫. উপকরণ বনাম ইবাদত: বিভিন্ন ভুলভ্রান্তি

প্রাচীন যুগ থেকেই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে দা'ওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি, দল ও মতের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয়। প্রত্যেকেই কুরআন ও হাদীস থেকে নিজেদের কর্মের অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি যুগ ও পরিবেশের চাহিদা মোতাবেক কিছু নতুন পদ্ধতি সংযোজন করেছেন। সাধারণভাবে এ সকল পদ্ধতি ইবাদত হিসাবে চালু করা হয় নি। ইবাদত পালনের সহায়ক উপকরণ হিসাবেই এগুলিকে চালু করা হয়েছে। কিন্তু কালের আবর্তনের সাথে সাথে এ সকল পদ্ধতির অনুসারীরা এসকল পদ্ধতিকে ইবাদতের অংশ বলে মনে করে বিভ্রান্তি ও দলাদলির মধ্যে নিপতিত হয়েছেন।

এ সকল নব উদ্ভাবিত দল বা পদ্ধতির ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় লক্ষণীয়:

প্রথমত, মাসনূন উপকরণগুলি প্রয়োজনানুসারে "খেলাফে সুন্নাত"-ভাবে সীমিত করা বা নির্ধারিত করা। যেমন কুরআন, হাদীস, ওয়ায ইত্যাদির মাধ্যমে দা'ওয়াত প্রদানের জন্য রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কোনো সিলেবাস-পাঠ্যক্রম,

সময়, স্থান বা পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেন নি। এ সকল উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে প্রয়োজন অনুসারে তা নির্ধারিত করা হয়েছে। নির্ধারিত গ্রন্থাবলী পড়ার বা নির্ধারিত দিন, মাস বা বছর ধরে বা নির্ধারিত সময়ে বা স্থানে দা'ওয়াতী কর্ম করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এগুলির মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে 'খেলাফে সুন্নাত' বা 'সুন্নাত বহির্ভূত' নতুন কিছু উপকরণ বা পদ্ধতি সংযুক্ত করা হয়েছে।

অনেক সময় এ প্রকারের সংযোজন বা নির্ধারণের জন্য কুরআন-হাদীস থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া হয়। যেমন আল্লাহ রামযানে একমাস রোযা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কাজেই আমরা আমাদের দা'ওয়াতের কোর্স 'একমাস' নির্ধারণ করেছি। এর মধ্যে বিশেষ বরকত পাওয়া যাবে। অথবা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দশ দিন ইতিকাফ করতেন, এজন্য আমরা আমাদের ওয়ায মাহফিল দশদিনব্যাপী করেছি। অথবা তিনি হিজরত করে চিরস্থায়ীভাবে মক্কা শরীফ ত্যাগ করে মদীনায় গমন করেছিলেন, এজন্য আমরা দা'ওয়াত, ওয়ায বা দীন প্রতিষ্ঠার জন্য এক দেশের মানুষকে হিজরত করে অন্য দেশে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করি। অথবা তিনি হজ্জের সময় ইহরামের কাপড় পরিধান করতেন, এজন্য আমরা 'দা'য়ী'দেরকে দা'ওয়াতের সময় ইহরামের কাপড় পরিধান করার ব্যবস্থা করেছি।

এ প্রকারের অনুপ্রেরণার ভাল দিক থাকলেও অনেক সময় তা বিদ'আত ও সুন্নাত বিরোধিতার জন্ম দেয়। যেমন, নামায আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন বা উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াতের জন্য তিনি এরূপ কোনো নির্দেশ বা উৎসাহ দেন নি। তিলাওয়াতের ইবাদত তিনি উন্মুক্তভাবে পালন করেছেন। বসে বা দাঁড়িয়ে যে কোনো অবস্থায় তিলাওয়াত করলে সমান সাওয়াব পাওয়া যাবে। এখন যদি কেউ মনে করেন যে, নামাযের জন্য দাঁড়ানো ফরয বা উত্তম অতএব তিলাওয়াতও দাঁড়িয়ে করা উত্তম বা দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করলে অতিরিক্ত সাওয়াব বা বরকত পাওয়া যাবে, তবে তিনি 'খেলাফে সুন্নাত' একটি কর্মকে ইবাদতের অংশ মনে করে বিদ'আত ও সুন্নাত বিরোধিতায় লিপ্ত হলেন।

আমি 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে সুন্নাত থেকে বিদ'আতে উত্তরণের বিভিন্ন কারণ ও পদ্ধতির আলোচনা করেছি। গ্রন্থটির পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চম পদ্ধতির আলোচনায় উপকরণকে ইবাদত মনে করার বিভিন্ন প্রবণতা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমি পাঠককে আবারো সবিনয়ে অনুরোধ করছি বইটি পড়তে। এখানে শুধুমাত্র একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বর্তমান সময়ে অনেক নেককার মুমিন দা'ওয়াতের কাজে রত রয়েছেন। সকলেরই উদ্দেশ্য আল্লাহর পথে দা'ওয়াতের মাধ্যমে সমাজের সর্বত্র ইসলামকে প্রতিপালিত ও প্রতিষ্ঠিত করা। এ সকল কাজের মধ্যে পার্থক্য :

প্রথমত, নাম ও পরিভাষা ব্যবহারে। তাযকিয়া, আন্দোলন, ইকামতে দীন, তাবলীগ, জিহাদ, মাদ্রাসা, ওয়ায ইত্যাদি বিভিন্ন নাম ব্যবহার করা হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু নির্ধারণে। ঈমান আকীদা, শিক্ষা, আত্মশুদ্ধি, ব্যক্তিগত কর্ম, সমাজ সেবা, রাজনৈতিক পরিবর্তন ইত্যাদি একেক দল একেক বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

তৃতীয়ত পদ্ধতিতে। বিভিন্ন দল বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাজ করছেন। পদ্ধতিগুলি কোনোটিই হুবহু 'মাসনূন' পদ্ধতি নয়।

এ সকল পদ্ধতিতে দা'ওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠায় রত অনেকেই এসকল 'খেলাফে সুন্নাত' বা 'সুন্নাত বহির্ভূত' পদ্ধতি ও উপকরণকে মূল ইবাদত 'দা'ওয়াত'-এর অংশ মনে করছেন এবং বিভিন্ন বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হচ্ছেন।

প্রথমত, একে অন্যের দা'ওয়াতের ইবাদত পালিত হচ্ছে না বলে মনে করছেন। কেউ হয়ত ওয়ায, গ্রন্থরচনা, মাদ্রাসা ইত্যাদি মাধ্যমে দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন করছেন, কিন্তু অন্য পদ্ধতির দা'য়ী ভাবছেন, যেহেতু তিনি আমার পদ্ধতিতে কাজ করছেন না, সেহেতু তার 'দা'ওয়াতের' ইবাদত পালিত হচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত, অনেক সময় একে অন্যের কোনো ইবাদতই হচ্ছে না বলে মনে করছেন। যেহেতু ঐ ব্যক্তির "দা'ওয়াত" বা "দীন প্রতিষ্ঠা" নামক ই পালিত হচ্ছে না, সেহেতু তার অন্য কোনো ফরয, সুন্নাত ও নফল ইবাদত কবুল হচ্ছে না। কাজেই আমার পদ্ধতির বাইরে যারা রয়েছেন তাদের নামায, রোযা, হজ্জ, যিকির, তিলাওয়াত, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি সবই মূল্যহীন বা অপূর্ণ।

এ সকল বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ হলো নব উদ্ভাবিত খেলাফে সুন্নাত উপকরণ বা পদ্ধতিকে মূল ইবাদতের অংশ মনে করা। আমাদের উচিত পদ্ধতির চেয়ে মুল ইবাদতের দিকে বেশি লক্ষ্য রাখা, নিজের ইবাদত কবুল হচ্ছে কিনা সেদিকে বেশি লক্ষ্য রাখা এবং সকল মুসলিম ও সকল দা'য়ীকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা।

সবচেয়ে দুঃখজনক হলো এ সকল কারণে দলাদলির জন্ম নেওয়া। কুরআন ও হাদীসে উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাক বা দলাদলি কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। "কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা" গ্রন্থে আমি এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীস বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ইসলামে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু দলভেদ থাকতে পারে না। বস্তুত আমাদের একটিই দল আছে, তার নাম "ইসলাম"। সকল মুসলিম আল্লাহর দল এবং সকল কাফির শয়তানের দল। শয়তানের দলকে মুমিন অন্য দল বলে মনে করেন। কোনো মুসলিমকে অন্য মুসলিম অন্য দল বলে মনে করতে পারেন না। পদ্ধতিগত বা মতামতগত পার্থক্যের কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে দলাদলি ও বিভক্তি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয়।

শেষ কথা

সম্মানিত পাঠক, দা'ওয়াতের পূর্ণতা, কবুলিয়্যত ও সফলতার জন্য দা'য়ী মুবাল্লিগদের পারস্পরিক সম্প্রীতি, মহব্বত ও ঐক্য প্রয়োজন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে দীন প্রতিষ্ঠা করতে এবং দলাদলি-মতভেদ না করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আমরা দলাদলি মতভেদে লিপ্ত রয়েছি। আমরা সকলেই ঐক্যের কথা বলছি। কিন্তু ঐক্য হচ্ছে না কেন?

অনেক কারণ থাকতে পারে। একটি কারণ হলো, আমরা প্রত্যেকেই নিজের দায়িত্বের চেয়ে অন্যের দায়িত্বের কথা বেশি চিন্তা করছি। প্রত্যেকেই মনে করছি, এ বিভক্তি বা বিচ্ছিন্নতার জন্য আমি বা আমার দল দায়ী নয়, বরং অমুক বা তমুক দায়ী। তবে প্রকৃত কথা হলো আমরা সকলেই কমবেশি অপরাধী। আমাদের প্রয়োজন, নিজের দায়িত্বের দিকে বেশি লক্ষ্য রাখা। অন্যেরা আমার বিরুদ্ধে যাই করুক, আমি সকল দা'য়ীকে ভালবাসব, সবাইকে আমার আন্দোলনের কর্মী ও আমার কাফেলার সাথী বলে মনে করব। সম্ভব হলে অন্যের ভুলত্রুটি ভালবেসে সংশোধনের চেষ্টা করব। নইলে আল্লাহর কাছে তাদের সংশোধনের দোয়া করব। নিজের দায়িত্ব পালনে আমি সচেষ্ট থাকব।

ঐক্য বলতে সকল দা'য়ী একই মাদ্রাসায় পড়াবেন বা একই পদ্ধতিতে দা'ওয়াত দিবেন বলে আমরা আশা করতে পারি না। একই শহরে কুরআন শিক্ষার বিভিন্ন কারিকুলাম ও পদ্ধতির অনেকগুলি মাদ্রাসা থাকতে পারে। সবারই উদ্দেশ্য কুরআন শিক্ষা। তবে পদ্ধতির ত্রুটি ও শিক্ষকদের আমলের ত্রুটি থাকতে পারে। তা সত্ত্বেও সকলের মধ্যে মহব্বত ও 'একই কাফেলার সহযাত্রী'-র অনুভূতি থাকা প্রয়োজন। সম্ভব হলে পরস্পরের ভুলত্রুটি ভালবেসে সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। না হলে কুরআনের খাদেম হিসাবে ত্রুটিসহই ভালবাসতে হবে। না হলে প্রত্যেকে নিজের মত কাজ করতে হবে। কিন্তু যদি সকল মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ সর্বদা পরস্পরের পদ্ধতি ও কর্মের দোষত্রুটির সন্ধান, আবিষ্কার ও প্রচারে ব্যস্ত থাকেন তাহলে কি কুরআনের খিদমত ভালভাবে হবে?

মহান আল্লাহ দয়া করে দা'ওয়াতের ময়দানে কর্মরত সকলের ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন, তাঁদের প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন।

দা'ওয়াত বিষয়ক এই ক্ষুদ্র আলোচনার এখানেই ইতি টানছি। এর মধ্যে যদি কোনো কল্যাণকর কিছু থাকে তবে তা আমার করুণাময় প্রতিপালক আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর একান্ত দয়া। আর এর মধ্যে ভুলভ্রান্তি যা আছে তা সবই আমার নিজের দুর্বলতা ও শয়তানের প্রবঞ্চনার কারণে। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সকল প্রশংসাই তাঁর। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয়তম হাবীব ও খলীল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ), তাঁর পরিজন, সহচর ও অনুসারীগণের উপর।

গ্রন্থকার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ঃ

১. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা
২. এহইয়াউস সুনান সুন্নাতের পুরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন
৩. হাদীসের নামে জালিয়াতিঃ প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা
৪. রাহে বেলায়াতঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর যিকর-ওযীফা
৫. মুসলমানী নেসাবঃ আরকানে ইসলাম ও ওযীফায়ে রাসূল(ﷺ)
৬. বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত : গুরুত্ব ও প্রয়োগ
৭. সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর
৮. মুনাজাত ও নামায
৯. সহীহ মাসনূন ওযীফা
১০. খুতবাতুল ইসলাম-জুমআর খুতবা ও সমকালীন প্রসঙ্গ
১১. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাতঃ ফযীলত ও আমল
১২. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোষাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা
১৩. ইসলামের নামে জঙ্গিবাদঃ আলোচিত ও অনালোচিত কারণসমূহ
১৪. بُحُوثٌ فِي عُلُومِ الْحَدِيْثِ (বুহূসুন ফী উলুমিল হাদীস)
15.A Woman From Desert
১৬ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর পোশাক
১৭. মুসনাদ আহমদ (ইমাম আহমদ রচিত)ঃ বঙ্গানুবাদ (আংশিক)
১৮. ইযহারুল হক্ক (আল্লামা শাইখ রাহমাতুল্লাহ কিরানবী রচিত)ঃ বঙ্গানুবাদ
১৯. ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার ((মুফতী আমীমুল ইহসান রচিত)ঃ বঙ্গানুবাদ
২০. ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর আল-ফিকহুল আকবারঃ বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা

সংগ্রহ বা পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

১. **মো. বাহাউদ্দীন**, ম্যানেজার, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা), বি.বি. রোড (পোস্ট অফিসের মোড়), ঝিনাইদহ-৭৩০০। মোবাইল নং-০১৭১১-১৫২৯৫৪, ০১৯২২-১৩৭৯২১
২. মো. আব্দুল মমিন ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। ফোন নং ০২-৯০০৯৭৩৮। মোবা. ০১১৯৯০৮৩৬৫২।
৩. মো. আনোয়ার হোসেন, ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ৬৬, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০। মোবা. ০১৯১৬২৬৭৩২৪, ০১৭১৫৫৯২৬৫১।